সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

মে ২০১৬

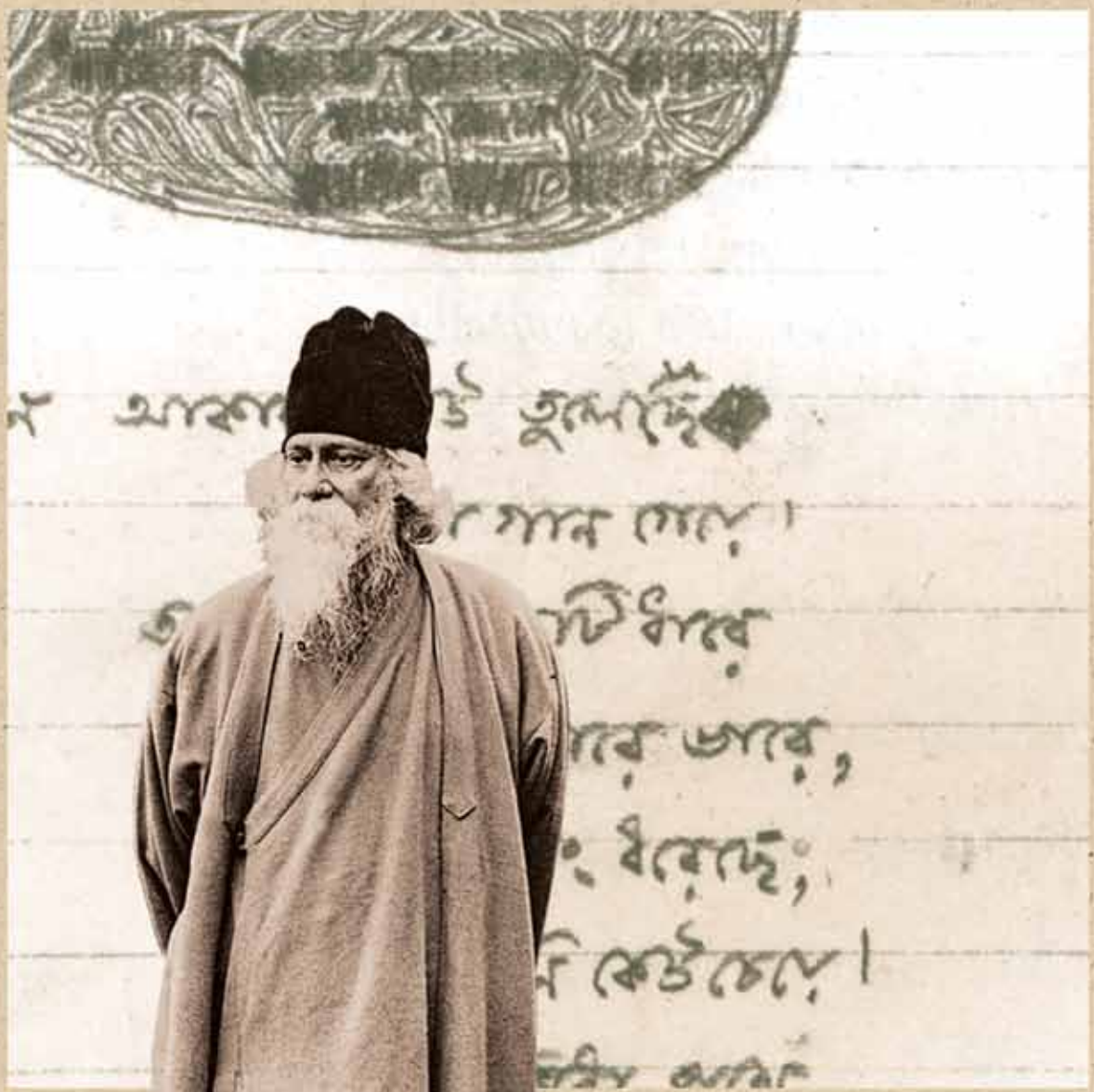

বড় অনুভবের কবি...

উপর থেকে নিচে

১. ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জির সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, বন ও পরিবেশমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা এবং তারিন হোসেন

২. ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে হাই কমিশনারের সাক্ষাৎ

৩. ০৬ এপ্রিল ২০১৬ হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে বাংলাদেশের পানিসম্পদমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদের সৌজন্য সাক্ষাৎ

৪. ১৩ এপ্রিল ২০১৬ হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে বাংলাদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমানের সৌজন্য সাক্ষাৎ

উপর থেকে নিচে

১. সার্ক কৃষি সম্মেলনে ভারতের কৃষিমন্ত্রী শ্রী রাধামোহন সিং-এর বক্তৃতা

২. ১২ এপ্রিল ২০১৬ হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে বাংলাদেশের সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূরের সৌজন্য সাক্ষাৎ

৩. ০৩ মে ২০১৬ তে হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের সৌজন্য সাক্ষাৎ

৪. ০৩ মে ২০১৬ হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আজিজ আহমেদের সাক্ষাৎ

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ চুয়াল্লিশ | সংখ্যা ০৪ | চৈত্র ১৪২২-বৈশাখ ১৪২৩ | মে ২০১৬

www.hcidhaka.gov.in
Facebook page: /IndiaInBangladesh; @ihcdhaka
IGCC Facebook page: /IndiraGandhiCulturalCentre

Bharat Bichitra
Facebook page: /BharatBichitra

জয়পুর আজমীর পুষ্কর

পৃষ্ঠা: ৩২

সূ চি প ত্র

কর্মযোগ — আম্বেদকর-জন্মবার্ষিকীতে হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ০৪
ঢাকায় ভারতের প্রতিমন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ০৬

প্রবন্ধ — রবীন্দ্র-বিশ্ব ॥ আনিসুজ্জামান ০৮
বড় অনুভবের কবি ॥ ইজাজ হোসেন ১০
রবীন্দ্রনাটক *রাজার* অনুবাদক ক্ষিতীশচন্দ্র সেন
সুরঞ্জন রায় ১৪
সত্যজিৎ ও ঋত্বিক দেখার রকমফের
সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ২০
বাংলা গানে আধুনিকতা ও নজরুলের গান
ড. সন্তোষ ঢালী ২৬

সৌহার্দ — ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ১৩

সম্প্রীতি — এক সুরে গাই গান ॥ করুণাসিন্ধু দাস ১৭

কবিতা — শাহীন রেজা ॥ লিলি হালদার ॥ আইউব সৈয়দ হাসান মোস্তফা ২৪
নিজাম উদ্দিন আহমেদ ॥ সুধীর কৈবর্ত
সরওয়ার মুর্শেদ ॥ সুমী সিকান্দার ॥ ২৫

ধারাবাহিক — পাসিং শো ॥ অমর মিত্র ৩০

ছোটগল্প — কোথাও কোথাও কান্না তৈরি হচ্ছে ॥ হামিদ রায়হান ৩৬

ভ্রমণ — জয়পুর-আজমীর-পুষ্কর ॥ জ্যোতিবিকাশ বড়ুয়া ৪২

শেষ পাতা — মৃণাল সেন ৪৮

০৮ থেকে ১৪

বিষয় রবীন্দ্রনাথ

শ্র দ্ধা ঞ্জ লি

আমরা জানি যে, কেবল পরিমাণ দিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেননি। আর এসব কথা যে তাঁর অজানা ছিল, তাও নয়। অন্যত্র তিনি যথার্থই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তাঁর ছোটগল্প ও গান স্থায়িত্বলাভ করবে: নিজের কবিতা বা নাটক, উপন্যাস বা প্রবন্ধ সম্পর্কে অনুরূপ আস্থা তাঁর ছিল না বলেই মনে হয়। তাছাড়া তিনি এটুকুই কেবল বলেছিলেন যে, বাংলা ভাষাকে তাঁর গড়ে নিতে হয়েছে। বোধহয় তিনি ভরসা করেছিলেন যে, তাঁর চিত্রকর্ম টিকে থাকবে– স্বদেশে না হলেও পাশ্চাত্য জগতে। চিত্রকলার উপলব্ধির বিষয়ে দেশবাসীর সামর্থ্যে তাঁর একেবারেই বিশ্বাস ছিল না।

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স মো. রেদওয়ানুর রহমান

মুদ্রণ ডটনেট লিমিটেড
৫১/৫১এ পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০ ফোন ৯৫৬২১৯৮

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৯৮৫০১৯৩-৭, ৯৮৮৮৭৮৯-৯১ এক্স: ১৪৯
ফ্যাক্স ৮৮-০২-৯৮৮২৫৫৫
e-mail: informa@hcidhaka.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি নং ২ সড়ক নং ১৪২ গুলশান-১ ঢাকা-১২১২

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

আলোকবর্তিকার সুখানুভূতি

আমি রাজবাড়ি জেলার একজন আগ্রহী পাঠক আমার কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে আপনার মাসিক পত্রিকাটির নতুন গ্রাহক অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা, চিত্রশিল্পী, ডিজাইনার ও সৌখিন ফটো সাংবাদিক। বর্তমানে আমি জেলা শিল্পকলা একাডেমি ও শিশু একাডেমির চারুকলা বিভাগের প্রশিক্ষক।

আমি স্বাধীনতার পর শুরু থেকে বেশ ক'বছর *ভারত বিচিত্রা*র গ্রাহক ছিলাম। *ভারত বিচিত্রা* আমার অন্তর্নিহিত মনের গহ্বরে আলোকবর্তিকার সুখানুভূতি হয়ে নাড়া দেয়। বহুদিন পর আইজিসিসি মিলনায়তনে আমার মেয়ে প্রীতি আলীর একক চিত্রপ্রদর্শনীতে এসে *ভারত বিচিত্রা*র একটি কপি হাতে পেয়ে খুশিতে আমার প্রাণ ভরে গেল।

আমি বাংলাদেশ ও ভারতের বন্ধুত্ব, সভ্যতার মূল্যবোধ, সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধে আবদ্ধ থাকতে চাই, পাশাপাশি রাজবাড়িতে আমরা কিভাবে *ভারত বিচিত্রা* পেতে পারি তার যথাযথ নির্দেশনা চাই।

মো. গোলাম আলী
আলপনা আর্ট গ্যালারি
বি/৩৫, বেড়াভাঙ্গা, সড়ক # ৩
রাজবাড়ী

সাহস পাচ্ছিলাম না

আমি *ভারত বিচিত্রা*র একজন ভক্ত পাঠক– বহুদিন থেকে *ভারত বিচিত্রা* পাঠ করে আসছি। পেশায় পোস্ট মাস্টার হওয়ায় আমার হাত দিয়েই পত্রিকাটি পাঠকের কাছে পৌঁছয়। আমার হাত দিয়ে কলেজের প্রভাষক, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে ক্লাবের সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক বা অন্যান্য ঠিকানায় পৌঁছয়, কিন্তু দিনের শেষে *ভারত বিচিত্রা*র একটি কপিও হাতে থাকে না পড়বার জন্যে। ফলে আমাকে হাওলাত করে *ভারত বিচিত্রা* পড়তে হয়। বিশাল ভারত, বিশাল তার বৈচিত্র্য। আমি বহুদিন ধরে ভাবছি, আপনার কাছে লিখব *ভারত বিচিত্রা*র গ্রাহক হওয়ার জন্য। কিন্তু সাহস পাচ্ছিলাম না। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমার নিজের নামে আমার বাড়িতে একটি ছোট পাঠাগার আছে সেখানে কলেজ, বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসার অনেক ছেলেমেয়ে পড়তে আসে। অন্যের কাছ থেকে সংগ্রহ করে এবং ধার করে যাতে পড়তে না হয় এবং নিজের সংগ্রহশালায় রাখতে পারি সেজন্যে আপনাকে এই অনুরোধ করা।

রাজু আহমেদ পোস্টম্যান
প্রজত্নে: নূরন নাহার বেগম (শিল্পী)
চন্দনতলা (পশ্চিম পাড়া), রিকাবী বাজার
মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ

জ্ঞানের দিগন্ত

আমি সুধাংশু শেখর হালদার টেকনিক্যাল এন্ড বিএম ইনস্টিটিউট, ঘোষকাঠি, নাজিরপুর, পিরোজপুরের প্রভাষকমণ্ডলীর পক্ষে এ চিঠি লিখছি। সম্প্রতি আমাদের এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে ভারতীয় হাই কমিশন থেকে প্রকাশিত *ভারত বিচিত্রা* পাঠ করে প্রভূত উপকৃত ও উৎসাহিত হয়েছি। আমাদের কলেজের অধ্যাপক ও প্রভাষকমণ্ডলীর সবাই সনাতন ধর্মাবলম্বী। এর ছাত্র-ছাত্রীদেরও অধিকাংশ সনাতন হিন্দু ধর্মের অনুসারী। *ভারত বিচিত্রা* প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার পাশাপাশি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের খবর পরিবেশন করে আমাদের জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত করছে। তাই এই মূল্যবান পত্রিকাটি আমাদের কাছে অপরিহার্য মনে হয়েছে।

এমতাবস্থায় আপনার মাধ্যমে *ভারত বিচিত্রা* নিয়মিত সৌজন্য সংখ্যা হিসেবে পেলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

নীহাররঞ্জন বিশ্বাস প্রভাষক, বাংলা
সুধাংশু শেখর হালদার টেকনিক্যাল
এন্ড বিএম ইনস্টিটিউট
গ্রাম ও ডাকঘর: ঘোষকাঠি, উপজেলা: নাজিরপুর
পিরোজপুর

ভীষণ ভক্ত

আমাদের বিদ্যালয়ে ১৩জন শিক্ষক ও ৬৫০জন ছাত্র-ছাত্রী আপনার বহুল প্রচারিত শিক্ষামূলক পত্রিকাটি বিভিন্নজনের কাছ থেকে ধার করে মাঝেমধ্যে পড়ে থাকেন। সবাই পত্রিকাটির ভীষণ ভক্ত এবং নিয়মিত পাঠ করে জ্ঞানার্জনে অতিশয় আগ্রহী কিন্তু *ভারত বিচিত্রা* সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে কষ্টকর হওয়ায় আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি।

ভারত বিচিত্রা পত্রিকাটি আমরা নিয়মিত পেলে নিয়মিত পাঠ করে জ্ঞানার্জন করতে পারি।

সুকমল মজুমদার প্রধান শিক্ষক
জিইউকে উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রাম: নশরৎপুর, ডাকঘর: বোয়ালী, গাইবান্ধা সদর
গাইবান্ধা

হৃদয় স্পর্শ করেছে

আপনার সম্পাদিত *ভারত বিচিত্রা*র সাহিত্য বিভাগ, জীবনচরিত, বিজ্ঞানকাহিনি, নানাবিধ প্রবন্ধ এবং কবিতা আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে। আমি দারুণভাবে অনুপ্রাণিত। আপনার পত্রিকার একজন পাঠক হিসেবে আমাদের ক্লাবে এক কপি *ভারত বিচিত্রা* নিয়মিত পাঠাবার আবেদন করছি।

ইবাদুল ইসলাম সাহিত্য সম্পাদক
লাউতাড়া জাগরণী ক্লাব ও সাধারণ গ্রন্থাগার
গ্রাম: লাউতাড়া, ডাকঘর: সুভাষিণী
উপজেলা: তালা, সাতক্ষীরা

খ্রিস্টীয় শুভেচ্ছা

বরিশাল সদর ব্যাপ্টিস্ট মিশন চার্চের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই খ্রিস্টীয় শুভেচ্ছা। আমাদের চার্চের একটি কার্যক্রম খ্রিষ্টীয় সাহিত্য কেন্দ্র– যেখানে প্রতিদিন বিভিন্ন ধর্মের ও গোত্রের লোকজন সমবেত হন এবং দৈনিক পত্রিকা ও বিভিন্ন পুস্তক পাঠ করে থাকেন। এই প্রতিষ্ঠানটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। আপনাদের সমৃদ্ধ *ভারত বিচিত্রা* নিয়মিত পেলে সমাজের নানা স্তরের মানুষ উপকৃত হবে। তাই. *ভারত বিচিত্রা* নিয়মিত পাবার ব্যবস্থা করে কৃতজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করবেন।

মেরি জনসন গুহ আহ্বায়ক
খ্রিস্টীয় সাহিত্য কেন্দ্র
বরিশাল সদর ব্যাপ্টিস্ট মিশন চার্চ
বরিশাল

সম্পাদকীয়

বাংলা সাহিত্যের পাঠ যাঁরা নিয়েছেন তাঁরা জানেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কাছে কতখানি। আমরা যারা সাহিত্যের পাঠ নিইনি, কিঞ্চিৎ পড়ালেখা করেছিমাত্র সাহিত্য নিয়ে, তারও জানি, রবীন্দ্রনাথকে ছাড়া আমাদের চলে না। তিনি আমাদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে, বিশ্বাসের সঙ্গে, প্রতিদিনে-প্রতিক্ষণে মিশে আছেন– কী যে অমোঘ টান! অতীতে এবং এখনও রবীন্দ্রনাথকে সযত্নে এড়িয়ে চলতে চায় আমাদের সমাজের একটি শ্রেণি। এরা খুব সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর বিশালত্ব খর্ব করার চেষ্টা করে কিন্তু যাঁকে নিয়ে তাদের এ আস্ফালন, তিনি কিন্তু তাঁকে গুরুদেবের আসনে বসিয়েছিলেন দ্বিধাহীন চিত্তে। ইতোমধ্যে তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে; মৃত্যুরও পঁচাত্তর বছর অতিক্রান্ত– তবু তাঁকে ছাড়া আমাদের চলছে না। তিনি আজও আমাদের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। বলা যায় অপরিহার্য। তাঁর পরে এমন আরেকজন প্রতিভাবানও আসেননি, যিনি তাঁকে অতিক্রম করতে পারেন। প্রতিদিন কোন-না কোনভাবে আমরা রবীন্দ্রপাঠশালায় দীক্ষা নিচ্ছি। তিনি আমাদের যাবতীয় সুচিন্তার আধার। তিনি উদার আলোক। বরিকরোজ্জ্বল বিশ্ব আমাদের চির ঈপ্সিত, পরম কাঙ্ক্ষিত।

তাঁর *গল্পগুচ্ছ*র একেকটি গল্প যেন একেকটি রত্নখনি। নয় থেকে নব্বই– যে কোন বয়সের পাঠক তাঁর গল্প থেকে জীবনরস সংগ্রহ করতে পারেন। এসব গল্প পড়তে গেলে জীবনের নতুন নতুন মানে পাঠকের কাছে ধরা দেয়। তাঁর গান অবিনাশী; অনিঃশেষ– আমাদের আনন্দ-বেদনার কাব্য। তাঁর কবিতা, নাটক, তাঁর উপন্যাস, তাঁর নৃত্যনাট্য অভিনবত্বে ও চমৎকারিত্বে বিশিষ্ট। তবে পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথ যতখানি উপাদেয় পাঠ্য, তাঁর প্রবন্ধ ঠিক ততখানিই দূরের। তাঁর ভাষা সরল কিন্তু বক্তব্য জটিল। এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। বঙ্কিমের ভাষা জটিল, বক্তব্য সরল। তাঁর গানের কথায় রয়েছে নানা ভাবের প্রকাশ, সুরে যুক্ত হয়েছে নানা সূত্র থেকে বয়ে আসা ধারা– উত্তর ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীত, দক্ষিণ ভারতীয় ঐতিহ্য, তাঁর সমকালীন পাশ্চাত্য সংগীত, বাংলার কীর্তন, বাউল ও লোকগীতি। সত্তর বয়সের কাছাকাছি এসে তিনি ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন, পাশ্চাত্যের শিল্পরসিকেরা তাতে মোহিত হয়ে গেলেন। মনে করা হয় যে, জীবনের অপেক্ষাকৃত অন্ধকার দিকটি বেশি করে ধরা পড়েছে তাঁর চিত্রে, ফলে তা হয়েছে তাঁর সাহিত্যকর্মের সম্পূরক অভিব্যক্তি। ক্লান্তিহীন এই মানুষটি একই কবিতার একাধিক ভাষ্য নির্মাণ করেছেন, একই নাটকের একাধিক রূপ দিয়েছেন, ছোটগল্প ও উপন্যাসকে রূপান্তরিত করেছেন নাটক ও নৃত্যনাট্যে। যে-সব শিল্পকর্মে তিনি হাত দেন, সে-সব ক্ষেত্রে এতদূরে তিনি পৌঁছে যান যে, একই হাত থেকে এমন অনিঃশেষ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে, তা কল্পনা করাও হয়ে যায় কঠিন। আর এই সবকিছুর মধ্যে তিনি খুঁজে বেড়িয়েছেন মানুষের সঙ্গে মানুষের, সমাজের, প্রকৃতির, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধ, বলেছেন পার্থিব ও আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে, ভবিষ্যতের জন্যে রেখে গেছেন সকলপ্রকার আবেগ ও অনুভূতির কথা।...

আম্বেদকর-জন্মবার্ষিকীতে হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

আম্বেদকর সাম্য ও গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, বর্ণবৈষম্য, লিঙ্গ-সাম্য ও নারী অধিকার আন্দোলনের নায়ক

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচটি ইমাম; ল' কমিশনের সদস্য ড. শাহ আলম; বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির সভাপতি প্রফেসর এমেরিটাস ড. এ কে আজাদ চৌধুরী; ভদ্রমহিলা ও মহোদয়বৃন্দ–

ভারতীয় হাই কমিশন ও বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির পক্ষ থেকে ড. বাবাসাহেব আম্বেদকরের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাই।

আধুনিক ইতিহাসে গুটিকয়েক মানুষ আছেন যাঁরা আমাদের অনুপ্রাণিত করেন এবং তাঁদের জীবৎকালের পরেও প্রাসঙ্গিক। ড. আম্বেদকর এঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁকে ছাড়া ভারত হয়তো অন্য একটি দেশ হত। বৈষম্যহীন সমাজগঠনে তাঁর জীবন, তাঁর অবদান, তাঁর ঋণ অতুলনীয়। ড. আম্বেদকর আজও আশার আলো এবং লাখ লাখ মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস। আজকের উদ্‌যাপন শুধু তাঁর জীবন ও কর্মের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন নয়, আমাদের সমাজের জন্য তিনি যে লক্ষ্য স্থির করে গিয়েছিলেন, সেগুলো পুনরায় স্মরণ করা।

ড. আম্বেদকর আজ থেকে একশো পঁচিশ বছর আগে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল সেন্ট্রাল প্রভিন্সের ইন্দোরে মোহ্ ক্যান্টনমেন্টে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম আইনমন্ত্রী এবং ভারতীয় সংবিধানের প্রধান নির্মাতা। সংবিধানের খসড়া কমিটির সভাপতি হিসেবে তাঁকেই ভারতীয় সংবিধান রচনার যাবতীয় কষ্টস্বীকার এবং সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হয়েছিল। ভারতীয় সংবিধান জটিল হলেও একটি সম্প্রসারিত দলিল। এটি সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং অস্বাভাবিক হলেও জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছে এবং ভারতীয় সমাজের চালিকাশক্তি হিসেবে বিদ্যমান।

আম্বেদকরের চিন্তাধারা ও দর্শন ভারতীয় সংবিধানে স্থান পেয়েছে। সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্যের ওপর ভিত্তি করে তাঁর গণতন্ত্রের স্বপ্ন সংবিধানে মূর্ত রূপ পেয়েছে। সেগুলো নীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং আমাদের দেশের সামাজিক বুনটে সঞ্চারিত হয়ে তাকে অধিক সমতাবাদী ও ন্যায়ভিত্তিক করেছে।

আম্বেদকরের নিজের জীবনকাহিনি উপমহাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে সংগ্রাম ও বেদনাদায়ক

রাজশাহী সহকারী ভারতীয় হাই কমিশনের কর্মব্যস্ততা

১. ০৪ এপ্রিল ২০১৬ বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির কর্মকর্তাদের সঙ্গে রাজশাহীতে নিযুক্ত সহকারী ভারতীয় হাই কমিশনার অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়; ২. ১৬ এপ্রিল ২০১৬ রাজশাহী বিভাগের মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরসূরীদের মধ্যে ভারত সরকারের দেওয়া বৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, শিক্ষাবিদ ও কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক, অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

অনুভবের ইতিহাস। তিনি এমন এক সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যাদের সুযোগ ছিল সীমিত আর জন্মের জন্যেই বৈষম্যের মুখোমুখি হওয়ার নিয়তি। তিনি এসব প্রতিকূলতা জয় করেছিলেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স থেকে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। দেশে ফিরে তিনি প্রান্তিক মানুষদের জন্য রাজনৈতিক সংগ্রামে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন।

আম্বেদকরের মেধার বিশ্লেষণ এবং অধীত বিদ্যার ছোঁয়া তাঁর পাণ্ডিত্য ও লেখালেখিতে ধরা পড়ে। তাঁর ছিল সুচারু পাণ্ডিত্য ও এক মহান নেতার দৃষ্টিভঙ্গি। তার লেখালেখি ও বক্তৃতায় ছিল চিরন্তন সত্যের উদ্ভাস। এর কারণ এই যে, আম্বেদকর হচ্ছেন সাম্য ও গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, বর্ণভিত্তিক বৈষম্য, লিঙ্গ-সাম্য ও নারীর অধিকার আদায়ের আন্দোলনের নায়ক। আমরা সবাই উপমহাদেশের বর্ণভিত্তিক ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলায় ড. আম্বেদকরের অবদানের কথা জানি। একইসঙ্গে নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠায় আইন প্রণয়নে ভারতীয় সংসদে তাঁর আপসহীন সংগ্রামের কথাও আমাদের জানা।

আম্বেদকরের সঙ্গে বাংলার একটা যোগাযোগ ছিল সে কথা হয়তো অনেকেই জানেন না। দেশভাগের আগে ১৯৪৬ সালে তিনি খুলনা, যশোর, বরিশাল ও ফরিদপুর নিয়ে গঠিত কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন। শুধু একটি সম্প্রদায় বা ভারত নয়, সামাজিক বিভাগ, ধর্মীয় সম্প্রদায় ও সীমান্ত পেরিয়েও তাঁর কাছে বহু মানুষের ঋণ। তিনি বিশ্বাস করতেন স্বাধীনতা অসীম তবে তার অর্থ সামাজিক ন্যায়বিচার অনুভবের মধ্যেই।

ভদ্রমহিলা ও মহোদয়বৃন্দ, আমাদের দুই দেশ যখন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথে এগোচ্ছে, জনগণকেও আমাদের সঙ্গে নিতে হবে। দারিদ্র্য দূরীকরণে আমাদের একযোগে কাজ করতে হবে এবং বৈষম্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নীতি উদ্ভাবন করতে হবে। ভারত ও বাংলাদেশের অনেক মিল রয়েছে– আমাদের অভিন্ন ইতিহাস, আমাদের সংস্কৃতি, পরিবার ও রক্তের বন্ধন, আমাদের অর্থনীতি ও আমাদের সমাজ। আমাদের নিয়তিও একসূত্রে গাঁথা। আমাদের লক্ষ্যও এক– দারিদ্র্য নির্মূল ও জনগণের উন্নয়ন, তাদের জন্য সামাজিকও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করা। আমাদের নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব লক্ষ্যের আলোকে আমাদের সম্পর্ক নিয়ে ভাবিত এবং এ সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সাফল্যের কথা যখন আমরা বলি তখন বাংলাদেশ একটি মডেল হিসেবে উল্লেখিত হয়। দেশটি নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে এবং ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন– সামাজিক বিভেদ এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য হ্রাস করছে। গত বছর জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনের গৃহীত টেকসই অর্থনৈতিক লক্ষ্যসমূহের উদ্দেশ্যে হচ্ছে ২০৩০-এর মধ্যে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা।

ভদ্রমহিলা ও মহোদয়বৃন্দ, অসাম্যের বিরুদ্ধে চলমান লড়াইয়ে তাঁর ভূমিকা ও গুরুত্বের স্বীকৃতি হিসেবে এই প্রথমবারের মত বিশ্বব্যাপী ড. আম্বেদকরের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। বার্ষিকীগুলো হচ্ছে ব্যর্থতা ও অর্জনের মূল্যায়নের উপলক্ষ্য। ড. আম্বেদকরের আদর্শ পরিমাপ করা এবং সে-সব অর্জনে পদক্ষেপ গ্রহণ করাই হচ্ছে আমাদের এই মুহূর্তের কাজ। ●

ভারতীয় আমদানিকারকদের বাংলাদেশ সফর

১. ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা মশিউর রহমান; ২. ৬-১০ এপ্রিল ২০১৬ ব্যবসায়ী ও সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সঙ্গে ইন্ডিয়ান ইমপোর্টার্স চেম্বার অফ কমার্স অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি শ্রী অতুলকুমার এবং অন্যান্য সদস্য ৩. ৩০ এপ্রিল ২০১৬ ঢাকার গুলশান ইয়ুথ ক্লাবে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ক্রিকেট দল ও ঢাকা-ভারতীয় ক্রিকেট দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত টি-২০ প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের খেলোয়াড়বৃন্দ

ঢাকায় ভারতের প্রতিমন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক গত কয়েক বছরে বাস্তবসম্মত ও পরিপক্ব হয়েছে

ঢাকায় ভারতের পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান
১. ঢাকা সফরকালে শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রসাদ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন; ২. বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রসাদের সৌজন্য বিনিময়; ৩. ঢাকা বিমানবন্দরে শ্রী প্রসাদকে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলার ফুলেল অভ্যর্থনা; ৪. ভারতীয় প্রতি মন্ত্রীর সঙ্গে শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

১৭-১৯ এপ্রিল ২০১৬ ঢাকা সফরে আসেন ভারতের পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। ২০১৫ সালের জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরকালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যে উচ্চাভিলাষী কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল, এ সফর তারই ফলশ্রুতি। ঢাকায় অবস্থানকালে শ্রী প্রধান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে জানান যে, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক গত কয়েক বছরে বাস্তবসম্মত ও পরিপক্ব হয়েছে। তিনি দু'দেশের মধ্যে হাইড্রোকার্বন খাতের বিভিন্ন সকল বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন। শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান নুমালিগড় রিফাইনারি লিমিটেডের শিলিগুড়ি মার্কেটিং টার্মিনাল থেকে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের পার্বতীপুর ডিপোয় ২,২০০ মেট্রিক টন হাই স্পিড ডিজেল সরবরাহের উল্লেখ করে বলেন, ভারত একইভাবে বাংলাদেশকে হাই স্পিড ডিজেল সরবরাহ অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা করেছে।

উভয় দেশের বিভিন্ন কোম্পানির মধ্যে হাইড্রোকার্বন খাতে পেট্রোলিয়াম পণ্য বাণিজ্য থেকে শুরু করে অনুসন্ধান এবং পরামর্শ সেবা ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিদ্যমান রয়েছে বলে শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান মন্তব্য করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর সরকারের উৎসাহব্যঞ্জক সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি আইওসিএল-এর চট্টগ্রামে এলপিজি আমদানি টার্মিনাল নির্মাণসহ বাংলাদেশে ভারতের হাইড্রোকার্বন অবকাঠামো প্রকল্প প্রস্তাবের বিস্তারিত বর্ণনা দেন এবং উভয় পক্ষের জন্য 'উইন উইন' অবস্থা তৈরির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রধানমন্ত্রীর আনুকূল্য প্রার্থনা করেন। শ্রী প্রধান ইন্দো-বাংলা মৈত্রী পাইপলাইনের বিষয়েও আলোচনা করেন এবং একে উভয় দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের বাংলাদেশ সফরকালে ১৮ এপ্রিল ঢাকার রেডিসন হোটেলে চট্টগ্রামে একটি তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলপিজি) টার্মিনাল স্থাপনে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগের এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের মধ্যে এ সমঝোতা স্বাক্ষরের সময় শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের সঙ্গে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ দিপু উপস্থিত ছিলেন। উভয় মন্ত্রী জ্বালানি সহযোগিতা বিষয়ে আলোচনা করেন। ১৯ এপ্রিল শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বাংলাদেশের প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শনে যান। সেখানে তিনি বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এ্যাডমিরাল এম খালেদ ইকবালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভারতীয় মন্ত্রীকে বন্দরের কর্মতৎপরতা ও প্রস্তাবিত উপকূলীয় টার্মিনাল সম্পর্কে অবহিত করা হয়। ভারতীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আসা প্রতিনিধিদল চট্টগ্রাম কন্টেইনার টার্মিনাল ও নিউ মুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল পরিদর্শন করেন।

১৯ এপ্রিল পতেঙ্গার ইস্টার্ন রিফাইনারি কমপ্লেক্সে উভয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে ইস্টার্ন রিফাইনারির দ্বিতীয় ইউনিটের ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা নিয়োগ সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দেশের একমাত্র সরকারি তৈল শোধনাগারের দ্বিতীয় ইউনিট স্থাপনে পরামর্শ সেবাদানের জন্য আন্তর্জাতিক টেন্ডারের মাধ্যমে কাজটি পেয়েছে ভারতের ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডিয়া লিমিটেড (ইআইএল)। এ কাজে খরচ হবে ১৫ হাজার কোটি টাকা। ইস্টার্ন রিফাইনারির পক্ষে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের পরিচালক জনাব মোসলেহ উদ্দিন ও ইআইএল-এর নির্বাহী পরিচালক উপেন্দ্র মহেশ্বরী চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ২০১৯ সালের মধ্যে এটির নির্মাণকাজ শেষ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এর বাৎসরিক তেল শোধন ক্ষমতা হবে ৩০ লাখ টন।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

চট্টগ্রামে সহকারী ভারতীয় হাই কমিশনের কর্মব্যস্ততা

১. ২০ এপ্রিল ২০১৬ চট্টগ্রামের থিয়েটার ইনস্টিটিউটে সহকারী ভারতীয় হাই কমিশনের উদ্যোগে অভ্যুদয় সংগীতাঙ্গনের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন; ২. ২৩ এপ্রিল ২০১৬ চট্টগ্রামের থিয়েটার ইনস্টিটিউটে চট্টগ্রাম বিভাগের মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরসূরীদের মধ্যে ভারত সরকারের বৃত্তি বিতরণ করেন প্রধান অতিথি চট্টগ্রামের মেয়র আ জ ম নাসিরুদ্দিন ও বিশেষ অতিথি বেগম মুশতারি শফি; ৩. ২৯ এপ্রিল ২০১৬ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা কুমিল্লায় রামকৃষ্ণ মিশনের অরফানেজ ডাইনিং হলের উদ্বোধন করেন

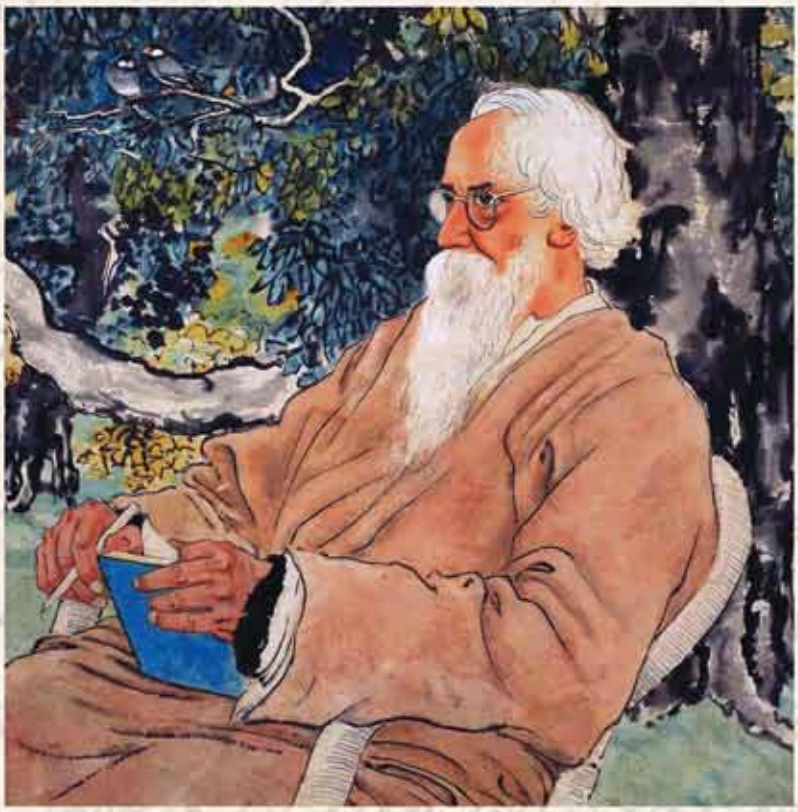

প্রবন্ধ

রবীন্দ্র-বিশ্ব

আনিসুজ্জামান

মৃত্যুর অল্প কয়েক মাস আগে রচিত একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়ে বলেই ফেলেছিলেন যে, সময়ের আবর্তনে তাঁর সকল কীর্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে:

আমার কীর্তিরে আমি করি না বিশ্বাস
জানি, কালসিন্ধু তারে
নিয়ত তরঙ্গাঘাতে দিনে দিনে দিবে লুপ্ত করি।

এমন কথা যে তিনি বলতে পেরেছিলেন, সেটা ভাবতেই আশ্চর্য লাগে। *বেঙ্গলি লিটারেচর* (অক্সফোর্ড, ১৯৪৮) বইতে জে সি ঘোষ খুব অল্পকথায় রবীন্দ্রনাথের আজীবন অর্জনের যে-পরিচয় তুলে ধরেছিলেন সেটা স্মরণ করা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে:

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবন ষাট বছরের বেশি সময় ধরে ব্যাপ্ত ছিল, রচনার পরিমাণ ও বৈচিত্র্যে তিনি ভিক্তর উগোকে মনে করিয়ে দেন: সহস্রাধিক কবিতা; প্রায় দু'ডজন নাটক-নাটিকা; আটটি উপন্যাস; আট বা ততোধিক ছোটগল্প গ্রন্থ; দুই সহস্রাধিক গান যার কথা ও সুর দু-ই তাঁর নিজের; তাছাড়া সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে অজস্র গদ্যরচনা । তার সঙ্গে যোগ করুন তাঁর স্বকৃত ইংরেজি অনুবাদ; তাঁর চিত্রকর্ম; এশিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপে তাঁর ভ্রমণ ও ভাষণদান; শিক্ষাবিদ, সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারক এবং রাজনীতিক হিসেবে তাঁর সক্রিয়তা; –এখানেই, কেবল পরিমাণের বিচারে, পাওয়া যায় এক টাইটানের জীবনব্যাপী কর্ম।

আমরা জানি যে, কেবল পরিমাণ দিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেননি। আর এসব কথা যে তাঁর অজানা ছিল, তাও নয়। অন্যত্র তিনি যথার্থই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তাঁর ছোটগল্প ও গান স্থায়িত্বলাভ করবে: নিজের কবিতা বা নাটক, উপন্যাস বা প্রবন্ধ সম্পর্কে অনুরূপ আস্থা তাঁর ছিল না বলেই মনে হয়। তাছাড়া তিনি এটুকুই কেবল বলেছিলেন যে, বাংলা ভাষাকে তাঁর গড়ে নিতে হয়েছে। বোধহয় তিনি ভরসা করেছিলেন যে, তাঁর চিত্রকর্ম টিকে থাকবে– স্বদেশে না হলেও পাশ্চাত্য জগতে। চিত্রকলার উপলব্ধির বিষয়ে দেশবাসীর সামর্থ্যে তাঁর একেবারেই বিশ্বাস ছিল না।

চিত্রকলা সম্পর্কে আমাদের রুচিনির্মাণের সময় হয়নি রবীন্দ্রনাথের, তবে অন্য সকল শিল্পরূপ সম্পর্কে আমাদের ভাবানুভূতি গড়ে উঠেছিল অনেকটাই তাঁর সৃষ্টিধারা থেকে। তাঁর লেখা পড়েই আমরা কবিতা ও পদ্যের পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন হই, আমরা বুঝতে পারি যে, মহাকাব্যের দিন গত হয়েছে। বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারা নিঃশেষ হয়েছিল তাঁর সামাজিক উপন্যাসের আবির্ভাবে। আমাদের সাহিত্যে তিনিই প্রবর্তন করেছিলেন ছোটগল্পের। ধীরে ধীরে কিন্তু সম্পূর্ণতই তিনি বাংলা নাটকের খোল-নলচে বদলে দিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত পত্র যে সাহিত্যের স্তরে উন্নীত হতে পারে, তা আমরা প্রথম জানলাম *ছিন্নপত্র* থেকে। তারপর তাঁর প্রবন্ধ– বিষয় ও রীতির কী অসাধারণ বৈচিত্র্য নিয়ে দেখা দিল। আর তাঁর গানের কথায় রয়েছে নানা ভাবের প্রকাশ, সুরে যুক্ত হয়েছে নানা সূত্র থেকে বয়ে আসা ধারা– উত্তর ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীত, দক্ষিণ ভারতীয় ঐতিহ্য, তাঁর সমকালীন পাশ্চাত্য সংগীত, বাংলার কীর্তন, বাউল ও লোকগীতি। সত্তর বয়সের কাছাকাছি এসে তিনি ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন, পাশ্চাত্যের শিল্পরসিকেরা তাতে মোহিত হয়ে গেলেন। মনে করা হয় যে, জীবনের অপেক্ষাকৃত অন্ধকার দিকটি বেশি করে ধরা পড়েছে তাঁর চিত্রে, ফলে তা হয়েছে তাঁর সাহিত্যকর্মের সম্পূরক অভিব্যক্তি। আরো বছর পাঁচেক পরে তিনি রূপ দিলেন নৃত্যনাট্যের– যেখানে নানা ধারার নৃত্যকলার রূপ ও রীতির মিলন ঘটেছে। ক্লান্তিহীন এই মানুষটি একই কবিতার একাধিক ভাষ্য নির্মাণ করেছেন, একই নাটকের একাধিক রূপ দিয়েছেন, ছোটগল্প ও উপন্যাসকে রূপান্তরিত করেছেন নাটক ও নৃত্যনাট্যে। যে-সব শিল্পকর্মে তিনি হাত দেন, সে-সব ক্ষেত্রে এতদূরে তিনি পৌঁছে যান যে, একই হাত থেকে এমন অনিঃশেষ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে, তা কল্পনা করাও হয়ে যায় কঠিন। আর এই সবকিছুর মধ্যে তিনি খুঁজে বেড়িয়েছেন মানুষের সঙ্গে মানুষের, সমাজের, প্রকৃতির, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধ, বলেছেন পার্থিব ও আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে, ভবিষ্যতের জন্যে রেখে গেছেন সকলপ্রকার আবেগ ও অনুভূতির কথা। ভেবে পাওয়া যায় না তারপর কী দুঃখবোধ, কী অতৃপ্তি তাঁর থেকে থাকতে পারে।

রবীন্দ্রনাথকে আমরা কাজের মানুষ হিসেবেও জেনেছি। পিতার আদেশে পারিবারিক সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতে ১৮৯০-এর দশকের বেশির ভাগ সময় তিনি কাটিয়েছিলেন এখনকার বাংলাদেশের পল্লি-অঞ্চলে। সেটি ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে সৃষ্টিশীল পর্বের একটি। এই নদীমাতৃক এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল, সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল তখন। এ দুই-ই তাঁর সৃজনশীল লেখার প্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়।

জমিদারির চাষিদের দুরবস্থা দেখে তিনি এতটাই অভিভূত হয়েছিলেন যে, পেশাদার মহাজনদের কবল থেকে তাদের রক্ষা করতে তিনি নিজে ঋণ করে স্বল্পহারের সুদে তাদের ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এর থেকে পরে প্রতিষ্ঠা ঘটে কৃষি ব্যাংকের এবং সূচনা হয় ক্ষুদ্রঋণপ্রদানের। তিনি কৃষিতে যন্ত্রচালিত লাঙল ব্যবহারের ব্যবস্থা করেন, নানা ধরনের ফসল নিয়ে পরীক্ষা করতে চাষিদের উদ্বুদ্ধ করেন, একটি বয়ন-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং কুটির শিল্পের পর্যায়ে বস্ত্রবয়ন-পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে কাজ করেন। সমবায়-সংগঠন গড়ে তুলতে তিনি প্রজাদের উৎসাহিত করেন, স্বনির্ভরতা বিকাশের উদ্দেশ্যে তাদের দিয়ে ছোট ছোট দল গঠন করার উদ্যোগ নেন, স্কুল স্থাপনের জন্যে গ্রামে জমি ও উপকরণ দান করেন। এ সকল প্রয়াসে তিনি যে সর্বদা সফল হয়েছিলেন তা কিন্তু নয়। গ্রামবাসীদের যুগ-যুগান্তের সংস্কার এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সময়েই তাঁর কাজের অন্তরায় হয়েছিল। যখন তিনি জল-সরবরাহ সহজলভ্য করতে গ্রামবাসীকে কূপ খননের পরামর্শ দিয়ে বললেন, কূপ তৈরি হয়ে গেলে নিজের খরচে তিনি তা পাকা করে বাঁধিয়ে দেবেন, কিংবা যখন তিনি রাস্তা সংস্কার করতে তাদের স্বেচ্ছাশ্রম দেওয়ার প্রস্তাব করলেন, তখন তিনি কোন সাড়া পেলেন না। কেন-না গ্রামের লোকের ধারণা হল যে, রাস্তা হলে বাবুদেরই চলাচলের সুবিধে হবে, তাতে গরিবদের কোন লাভ হবে না। তবে রবীন্দ্রনাথ হতোদ্যম হননি। পল্লি-পুনর্গঠনে তাঁর ভাবনা ও কাজের পরিচয় বহন করে পরে গড়ে ওঠে শ্রীনিকেতন, তেমনি শান্তিনিকেতন হয়ে ওঠে শিক্ষাবিষয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল ক্ষেত্র।

শিলাইদহে নিজের সন্তানদের পড়াতে গিয়েই শিক্ষাবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মূল ভাবনাগুলো জাগে। ইংরেজি শেখার গুরুত্ব স্বীকার করেও মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করতে তিনি জোর দিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষাভাবনার মূলে ছিল স্বাধীনতার ভাবটি। শিশুরা কেবল পাঠ্যপুস্তক থেকে জানবে না, তারা ইচ্ছেমত প্রকৃতির সঙ্গে লেনদেন করবে, খেলবে, গাইবে, নাচবে, ছবি আঁকবে এবং এভাবে নানাকিছু শিখবে। উঁচু শ্রেণির ছাত্র যে-বিষয়ে দুর্বল, সে-বিষয়ে নিচের শ্রেণির ছাত্রদের সঙ্গে বসে পাঠ নেবে। বিশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথের বোর্ডিং স্কুল রূপান্তরিত হয় বিশ্বভারতীতে যা সারা বিশ্বের মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠবে বলে তাঁর কল্পনায় ছিল।

অল্পবয়স থেকে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ শাসনের তীব্র সমালোচক হয়ে ওঠেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সামনে থেকে, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে সেখান থেকে সরে আসেন। তাঁর মনে হয়েছিল আন্দোলনটি ভুল পথে ও সংকীর্ণ বিবেচনায় চলছে। তারপর তিনি জাতীয়তাবাদের মূল ধারণা নিয়েই প্রশ্ন তোলেন এবং সমকালীন পৃথিবীতে তা খুব ক্ষতিকর হয়েছে বলে তা বর্জন করেন। তাঁর এই মতামত কেবল ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নয়, চিন ও জাপানেও বিরোধিতার সম্মুখীন হয় এবং ভারতবর্ষেও বহুজন তা অপছন্দ করেন। তবে রবীন্দ্রনাথ কখনোই দেশবাসীর হয়ে কথা বলতে পিছপা হননি। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর যখন কোন রাজনৈতিক নেতা এই বর্বরতার প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসেননি, তখন কবিই মুখ খুলেছিলেন এবং রাজার দেওয়া নাইটহুড ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। মহামান্যের সরকার অবশ্য কখনো তা স্বীকার করেননি। তবে ইংল্যান্ডের পত্রপত্রিকা এবং বিদ্বজ্জনেরা এ-কারণে রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যান। বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ আছে বলে সন্দেহ করেন ব্রিটিশ সরকার এবং প্রেসিডেন্ট উইলসনকে রবীন্দ্রনাথ বই উৎসর্গ করতে চাইলে এ-কারণ দেখিয়ে তাঁকে তা গ্রহণ না করতে পরামর্শ দেন। দেশে সরকার এক পরিপত্র জারি করে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয় সরকারি কর্মকর্তাদের সন্তানদের শিক্ষাগ্রহণের পক্ষে অনুপযুক্ত বলে অভিহিত করেন। তবু, শাসকদের হাতে দেশের সমূহ ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইংরেজের স্থায়ী আসন আছে।

উত্তরাধিকারসূত্রে রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক ধর্মমত লাভ করেছিলেন এবং পিতার ইচ্ছায় অল্পবয়সে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পরে তাঁর মনে সন্দেহ জাগে, সত্যিই কি তিনি ব্রাহ্মসমাজের মতের অনুবর্তী, নাকি তিনি একটা মুখোশ পরে আছে মাত্র। কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আশ্রয় নেওয়ার বদলে উত্তরজীবনে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মানুষের ধর্মই হল মানবত্ব– মানুষ হয়ে ওঠা।

আশি বছরের পূর্ণ জীবন লাভ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। চিন্তাভাবনার বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছেন তিনি। তিনি বলেছেন, অসংগতি হল একই সঙ্গে তাঁর দোষ ও গুণ। তাঁর জীবনে এমন সব মুহূর্ত দেখা দিয়েছে যখন তিনি যা প্রচার করেছেন তা অনুসরণ করতে পারেননি। কখনো তিনি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে আচ্ছন্ন হয়েছেন কিংবা প্রচার করেছেন গোষ্ঠীগত মত। কখনো তিনি বাহ্য আবরণ সরিয়ে প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তরে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নিজের ভুল বুঝতে পারলে নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা তিনি করেছেন। আত্মপরিচয়ের অনেকগুলো বৃত্তের মধ্যে তিনি বাস করেছেন। তিনি বাঙালি, ভারতীয়, এশীয়, সর্বোপরি বিশ্বজনীন মানুষ। যে-পথে বিশ্বজনীনতার লক্ষ্যে পৌঁছনো যায়, সে-পথ অনুসরণ করতে আমাদের আহ্বান করেন তিনি।

আনিসুজ্জামান শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

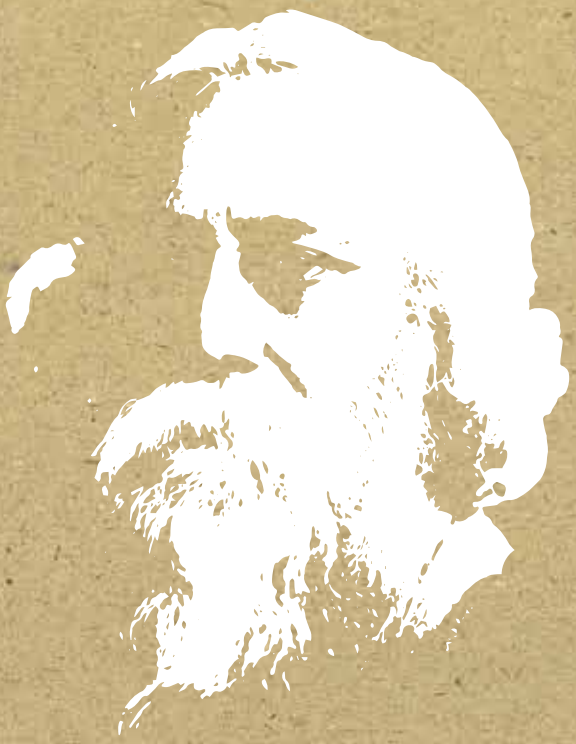

ভালোবেসে সখী, নিভৃত যতনে
আমার নামটি লিখো– তোমার
মনের মন্দিরে।
আমার পরাণে যে গান বাজিছে
তাহার তালটি শিখো– তোমার
চরণ মঞ্জীরে ॥
ধরিয়া রাখিয়ো সোহাগে আদরে
আমার মুখর পাখি– তোমার
প্রাসাদ প্রাঙ্গণে।
মনে ক'রে সখী, বাঁধিয়া রাখিয়ো
আমার হাতের রাখী– তোমার
কণককঙ্কনে ॥

প্রবন্ধ

বড় অনুভবের কবি

ইজাজ হোসেন

আর্য সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই ধর্মীয় বোধ তার অঙ্গীভূত বিষয়। ব্রাহ্মণ্য পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বিকশিত এই ভঙ্গি তাবৎ চৈতন্যের মূলাধারও বটে। এখানে একপাশে ভগবান এবং অন্যপাশে ভক্তের সারি বাঁধা উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। প্রথম অবস্থায় ভগবানের নীরবতা সার করা দূরে অবস্থিতি; ভক্তের সরব সজল আকূতি পুনঃ পুনঃ তাঁর হৃদয়কন্দরে ক্রমশ প্রবিষ্ট হতে হতে তিনি অবশেষে সরব হয়ে ওঠেন; মোক্ষ নামক সর্বপ্রাপ্তির আশীর্বাদ ভক্তের মস্তকে বর্ষণ করেন, তাদের জীবন ধন্য হয়।

ভক্ত ভগবানের এই যে পারস্পরিক সম্পর্ক, এখানে একজন অতি ক্ষুদ্র তো অন্যজন বিরাট বিশালত্বে জায়মান। তাই এই বোধ সর্বব্যাপী হলেও একজনের অতি ক্ষুদ্রতা কেন জানি না মনোবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়– মনুষ্যচেতনার নীচতলাশ্রয়ী অবয়বের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। কিন্তু যদি আমরা এরকম একজন ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাই, যিনি অকুণ্ঠ সরলতায় আপন ভক্তকে প্রায় সমপর্যায়ে উন্নীত করেন এবং তার মতামত প্রার্থী হন, তখন আমাদের মনোভঙ্গি কেমন স্তরে উপনীত হয়?

একি সত্য সকলই সত্য, হে আমার চিরভক্ত ॥
মোর নয়নের বিজুলি-উজল আলো
যেন ঈশান কোণের ঝটিকার মতো কালো একি সত্য।
মোর মধুর অধর বধূর নবীন অনুরাগ সম রক্ত
হে আমার চির ভক্ত, একি সত্য ॥
অতুল মাধুরী ফুটেছে আমার মাঝে
মোর চরণে চরণে সুধাসঙ্গীত বাজে এ কি সত্য।
মোরে না হেরিয়া নিশির শিশির ঝরে,
প্রভাত আলোকে পুলক আমারি তরে একি সত্য
মোর তপ্ত কপোল-পরশে অধীর সমীর মদির মত্ত
হে আমার চিরভক্ত, একি সত্য ॥

রবীন্দ্র প্রেম-ভাবনায় সিক্ত কতিপয় গান এবার আমাদের আলোচনার লক্ষ্য। এমন সর্বাংশে সুন্দর উচ্চ মানসম্পন্ন পবিত্রতা এর অঙ্গে জড়িত যে আমাদের ভাবনা এক বিস্ময়কর পরিণতিতে পৌঁছে। কোনক্রমে একে হৃদয় থেকে সরানো যায় না, এক অতুলনীয় অনুভবে তা আমাদের মনে গেঁথে বসে। কি আছে এর মধ্যে বরং বলা চলে কি নেই এর মধ্যে!

ভাবুন, অবিনশ্বর একক মহিমাময় সেই শক্তি কেমন চিরভক্তের মতামতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে আপন হৃদয়ে স্থাপন করেছেন। তিনি যে উপমাগুলি ব্যবহার করেছেন তাও মনুষ্য অস্তিত্বেও কি মনোমুগ্ধকর পরিণতি: যেমন– 'মোর মধুর অধর বধূর নবীণ অনুরাগ সম রক্ত', আর কি কিছু বলতে হবে? এই যে নবীন, সরস ভাবনাপ্রবাহ এ কি কোন বাঁধা-ধরা ধর্মীয় ছকের জীবনায়নে প্রাপ্য? কোনক্রমেই নয়। ভগবানের পেলব, মধুর জিজ্ঞাসা কি ভক্তকে প্রায় সমপর্যায়ে উন্নীত করেছে না? এমন ঈশ্বর, এমন ধর্মবোধের কাছে মনুষ্যমাত্রেরই কি অবনত মস্তক হতে ইচ্ছা করে না?

রবীন্দ্রনাথ এভাবেই প্রচলিত, প্রথাসিদ্ধ সনাতন পথে চালিত না হয়ে ধর্মবোধের নতুনতর আবহ সৃষ্টিতে সজাগ থাকছেন। তখন আমাদের অন্তরাত্মা নিঃসন্দেহে এমন ঈশ্বরকে প্রণিপাত করতে বিন্দুবিসর্গ চিন্তান্বিত হচ্ছে না। এই হচ্ছে রবীন্দ্র ধর্মবোধের বিস্ময়কর নতুনত্ব। এবার দেখুন ভক্ত ভগবানকে কি বলছে:

যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু ॥
যদি কোনো দিন এ বীণার তারে তব প্রিয় নাম নাহি ঝঙ্কারে
দয়া করে তবু রহিয়ো দাঁড়ায়ে ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু ॥

এ কেমন ভক্ত ও ভগবান?

ভগবান এখানে কোনক্রমেই যেন দূরের বস্তু নয়, একদম কাছের, হৃদয়ের প্রান্তদেশেই যেন তাঁর অবস্থিতি... তাই বুঝি অনায়াসে এমন বলা যায়–

যদি কোনো দিন তোমার আসনে আর কাহারও বসাই যতনে,
চিরদিবসের হে রাজা আমার, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু ॥

কেমন সম্পর্কের নিগড়ে এখানে পরস্পর আবদ্ধ? এই বোধ তো কোনও অর্থেই মধ্যযুগীয় ধর্মীয় আবহকে সম্মুখে আনে না বরং রেনেসাঁর বাণীমিশ্রিত ভাবনায় আমাদের আপ্লুত করে। আমাদের জীবন যেন কাঠিন্যের প্রাকার ভেঙে এক সর্বসুধাকর প্রবহমানতার আভাস জাগায়।

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রম হত যে মিছে ॥

এও-বা কেমন বাক্য পরম্পরা? প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক সর্বত্র যেখানে কার্যকর, সেখানে ত্রিভুনেশ্বরের প্রেমই মিথ্যে হত বলে ঘোষণা। এমন কথা কখন বলা যায়? যখন ভগবানের মহতীমহান ধারণা সমপর্যায়ে নেমে আসে, মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা আকাশ পর্যায়ে ওঠে তখনই তো এসব সমানতার ধারণা প্রবল হয়। চিন্তা ও চেতনার জগতে রবীন্দ্রনাথের এমন ধারণা আছে বলেই তো তিনি মহান রচয়িতা– সাধারণ মানুষের উর্ধ্বে তাঁর অবস্থান।

এবার দেখুন আরেক অনবদ্য অনুভব:

আমি যখন তার দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই তখন যাহা পাই
সে যে আমি হারাই বারে বারে ॥
তিনি যখন ভিক্ষা নিতে আসেন আমার দ্বারে
বন্ধ তালা ভেঙে দেখি আপন-মাঝে গোপন রতনভার,
হারায় না সে আর ॥

ভক্ত ও ভগবানের পারস্পরিক অবস্থিতি কেমন সংহত, সংযত। তিনি এলে তবেই সর্বপ্রাপ্তির আনন্দ অধিগত হয়, নইলে একতরফা ভিক্ষা শুধু ভিক্ষাতেই পরিণত হয়। সেখানে মহান মাধুর্য কোনক্রমেই লভ্য হতে পারে না।

দ্রব্য নয় স্বয়ং ঈশ্বরের অভ্যর্থনাই কাম্য। এই বোধ 'অনেক দিয়েছ নাথ' গানটিতে ধ্বনিত। তাকে পুরোপুরি অধিগত না করতে পারলে প্রাণের তৃষ্ণা মিটবার নয়:

দিয়েছ জীবন মম, প্রাণপ্রিয় পরিজন,
সুধাস্নিগ্ধ সমীরণ, নীলকান্ত অম্বর, শ্যামশোভা ধরণী।
এত যদি দিলে সখা আরো দিতে হবে হে–
তোমারে না পেলে আমি ফিরিব না, ফিরিব না ॥

শ্যামল বনানী, ছায়া স্নিগ্ধ ধরণীর আবহে বিমোহিত কবি রবীন্দ্রনাথের *পূজা* পর্যায়ের ৪৩৫সংখ্যক গানটিতে রবীন্দ্রদর্শনের ঠিক বিপরীত প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত। আমরা অবাক হয়ে ভাবি এমন উল্টো কথার বিবৃতি তাঁর কলম দিয়ে কেমন ভাবে বেরলো। অবশ্য *পূজা* পর্যায়ের গান বলে এর একটি ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। যেখানে স্রষ্টার গভীর ধ্যানে নিজের আত্মবিলোপের প্রবণতা প্রবল, সেখানে তার অনুপস্থিতির শোকার্ত বিলাপ এমন ভাষামাধুর্য তো পাবেই–

এ পরবাসে রবে কে হায়!
কে রবে এ সংশয়ে সন্তাপে শোকে ॥
হেথা কে রাখিবে দুখভয় সঙ্কটে–
তেমন আপন কেহ নাহি এ প্রান্তরে হায় রে ॥

কেমন যেন এক মরুভূ ধূসর প্রান্তরের প্রকট প্রতিচ্ছায়া এখানে মূর্তিমান। কিন্তু আমরা এও জানি, এটা যখন কোনও সার্থক কণ্ঠশিল্পীর অনবদ্য গলার আওয়াজে মূর্ত হয়, তখন তাতে মরুভূ প্রান্তরের সর্বক্লেশ অনায়াসে দূরীভূত হতে পারে। রবীন্দ্র প্রেম-ভাবনায় সিক্ত কতিপয় গান এবার আমাদের আলোচনার লক্ষ্য। এমন সর্বাংশে সুন্দর উচ্চ মানসম্পন্ন পবিত্রতা এর অঙ্গে জড়িত যে আমাদের ভাবনা এক বিস্ময়কর পরিণতিতে পৌঁছে। কোনক্রমে একে হৃদয় থেকে সরানো যায় না, এক অতুলনীয় অনুভবে তা আমাদের মনে গেঁথে বসে। কি আছে এর মধ্যে, বরং বলা চলে কি নেই এর মধ্যে! যেহেতু এটি সংগীত তাই ছন্দ, মিল, তান, লয় যেমন সর্বপ্রযত্নে উপস্থিত, তেমন মানুষের হৃদয়স্থিত সুধাবর্ষী এই অনবদ্য প্রেম-ভাবনা আমাদের সারা জীবনকে সবকিছু দিয়ে আপ্লুত করে। সুখ, শান্তি, তৃপ্তি, পূর্ণতা সকল কিছুই। যখন কেউ আমাদের সামনে মোহনীয় সুর সন্নিধানে গলা খোলেন:

ভালোবেসে সখী, নিভৃত যতনে
আমার নামটি লিখো– তোমার
মনের মন্দিরে।
আমার পরাণে যে গান বাজিছে
তাহার তালটি শিখো– তোমার
চরণ মঞ্জীরে ॥
ধরিয়া রাখিয়ো সোহাগে আদরে
আমার মুখর পাখি– তোমার
প্রাসাদ প্রাঙ্গণে।
মনে ক'রে সখী, বাঁধিয়া রাখিয়ো
আমার হাতের রাখী– তোমার
কণকককনে ॥

এবার কি আর কথা আছে কারু কণ্ঠে? সর্বপ্রাপ্তির পূর্ণতায় এমন আকুল করা ভাব যেন সৃষ্টিছাড়া প্রাপ্তিতে আমাদের আকুলিত করে। সেটি

কোনক্রমেই ভাববাদিতার উপরের স্তরের সামান্য প্রাপ্তি নয়। বস্তুনিষ্ঠ মনের শরসন্ধানী অনুসন্ধানও এখানে থমকে থেমে গেছে, এমন মনে হয়। এবং এটি কোনও বয়সের সীমানাপ্রান্তে এসে তার মূর্তমানতা ক্ষয় হবার নয়। সকলের জন্য সব বয়সের জন্য এটা সমভাবে প্রযোজ্য।

প্রেম-ভাবনার আরেক আকুল করা ভাব লক্ষ্যণীয় হয় ১৪২সংখ্যক গানটিতে–

আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই তুমি তাইগো

বোঝা যাচ্ছে, নিজের বলে কোন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই এমন বক্তব্যধারীর। দেখুন পরের ছত্র–

তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই
কিছু নাই গো ॥

অতঃপর–

তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও–
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়মাঝে, আর কিছু
নাহি চাই গো ॥

হল তো এবার মজনু-পারা অবস্থা। হৃদয়মাঝে অনুভবেই সর্বপ্রাপ্তির আনন্দ। আমরা স্বীকার করছি এতে আবেগধর্মিতা বেশি, সেই তুলনায় বাস্তবতা কম। কেন-না এটা আবেগের একতরফা বহিঃপ্রকাশ। তবে মজনুর প্রেমের যে বৈশিষ্ট্য তা কিন্তু এতে সুস্পষ্টতায় বিদ্যমান।

তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও, আমি যত
দুঃখ পাইগো ॥

এই উদার বক্তব্য যতই আবেগধর্মী হোক না কেন, এর বাস্তবতাও তেমনি অনস্বীকার্য।

প্রেম-ভাবনার ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতা অন্বেষণ অনেকটাই বৃথা হতে পারে। এ এমন জিনিস যে এর অস্তিত্ব অনস্বীকার্য, আবার ভাবনায় আনলে তা ভাববাদিতার পরাকাষ্ঠা হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে বস্তুবাদী এক লেখকের বিজ্ঞানবিষয়ক একটি উক্তি উদ্ধৃতি না দিলে মন মানছে না– 'দুগ্ধপোষ্য শিশু যখন পরম আকুলতায় মাতৃস্তনে সুধা অন্বেষণ করে, যখন রাখালিয়া বাঁশির সুরের সঙ্গে সোনালি শীষের বাতাসি নৃত্যছন্দে হিল্লোল ওঠে, যখন বছর কুড়ি পরে 'তার সঙ্গে দেখা হলে' শরীরের গহীন কোণে রক্ত ছলাৎ করে, যখন প্রিয়তমজনের মৃত্যুর পর হু-হু করা নির্ভার মন ভেসে যায় অন্যলোকে... তখন বিজ্ঞানের জায়গা কোথায়? স্পষ্ট করে লেখা নেই আজও এইসব অন্তর্লীন অনুভবের গতি-প্রকৃতির গণিত।' (বিজ্ঞানে অবগাহন: অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়)

আবহমান কালের বাংলার চিত্রপট খুললে আমরা দেখি: না, রবীন্দ্রনাথের আগে অন্য কেউ রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভা নিয়ে কদাপি আবির্ভূত হননি। স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে এমন সূক্ষ্ম অনুভবব্যঞ্জিত কোন বাক্যাবলি আমাদের কর্ণগোচর হয়নি। প্রেম বিষয়ে এমন গূঢ় গভীর মর্মবিদারী কথামালাও আমাদের শ্রবণে আসেনি। আমি স্মরণে রাখছি– মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব পদাবলীর রসনিঃসৃত অমিয় বাণীবিন্যাস; কিন্তু তারপর কেটে গেছে কয়েক শতাব্দীর নিঃশব্দ পদচারণা, কোন কিছুই লভ্য হয়নি আমাদের।

নতুন যুগে নতুন কথামালা অনেকদিন পর আপনকার মুখাবয়ব উন্মোচন করল। এবং আমরা তার মধ্যে অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম এই অবিসংবাদিত কথাকার রবীন্দ্রনাথকে। মেধা-নিষিক্ত ভাব-ভাবনায় বাঙালির জীবন রঞ্জিত হল। আমরা যে ছত্রগুলি তাঁর কাছ থেকে উপহার হিসেবে পেলাম, তাতে আমাদের শূন্যতাভরা জীবন যেন ফুলে-ফলে ভরভরন্ত হয়ে উঠল। আমি ব্যক্তিগত জীবনে এটা কখনও ভুলতে পারব না: সুখে অথবা সন্তাপে আমার একমাত্র আশ্রয় রবীন্দ্রসংগীত। সত্যি করে বলছি, যেইমাত্র আমার কানে রবীন্দ্রনাথের কথা ও সুরের অপূর্ব ব্যঞ্জনাঋদ্ধ গান– 'ভালোবেসে সখী নিভৃত যতনে আমার নামটি লিখো– তোমার মনের মন্দিরে'র শব্দাবলী ঢোকে, নিঃসন্দেহে তখন কেমন যেন অন্য মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যাই। কি এক অপরূপ ভালবাসায় ও ভাবে মন আমার পূর্ণ হয়ে ওঠে– আজ এই পরিণত বয়সেও। তাই জয়তু রবীন্দ্রনাথ– বাঙালির চিরদিবসের বড় অনুভবের অবিস্মরনীয় দোশর।

ইজাজ হোসেন শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

ঘটনাপঞ্জি ❖ মে

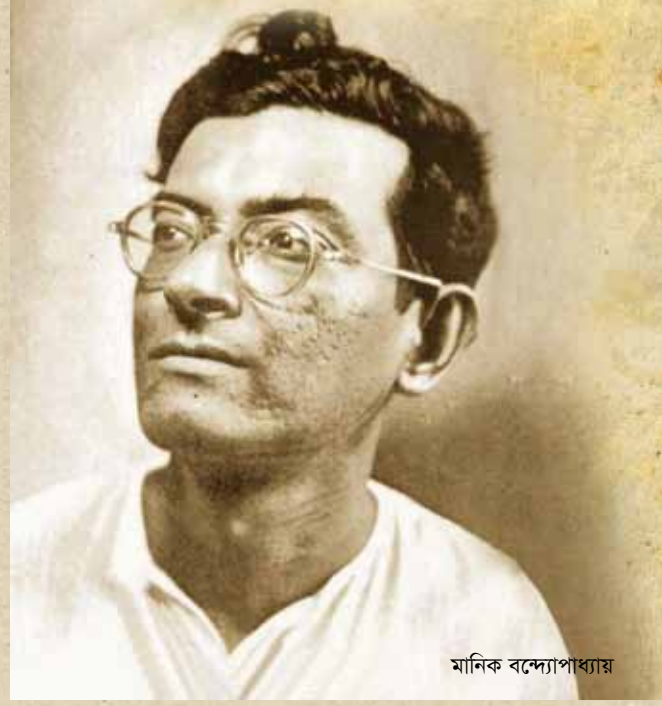

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

০১ মে ১৯১৯ ❖ কণ্ঠশিল্পী মান্না দে-র জন্ম
০২ মে ১৯২১ ❖ সত্যজিৎ রায়ের জন্ম
০৩ মে ১৯১৩ ❖ দাদা সাহেব ফালকের জন্ম
০৬ মে ১৮৬১ ❖ পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর জন্ম
০৭ মে ১৮৬১ ❖ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম
১০ মে ১৮৮৫ ❖ প্রমথনাথ বিশীর জন্ম
১০ মে ১৮৮২ ❖ গুরুসদয় দত্তর জন্ম
১০ মে ১৯০৫ ❖ পঙ্কজ মল্লিকের জন্ম
১৩ মে ১৯৪৭ ❖ সুকান্ত ভট্টাচার্যের মৃত্যু
১৩ মে ২০০১ ❖ আর কে নারায়ণের মৃত্যু
১৪ মে ১৯২৩ ❖ চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেনের জন্ম
১৫ মে ১৮১৭ ❖ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম
১৫ মে ২০০৫ ❖ লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার মৃত্যু
১৭ মে ১৯১৩ ❖ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার লাভ
১৯ মে ১৯০৮ ❖ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম
২১ মে ১৯৯১ ❖ রাজীব গান্ধীর মৃত্যু
২২ মে ১৭৭২ ❖ রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম
২৪ মে ১৮৯৯ ❖ কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম
২৭ মে ১৯৬৪ ❖ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মৃত্যু
৩১ মে ১৯২৮ ❖ বাঙালি ক্রিকেটার পঙ্কজ রায়ের জন্ম

সৌহার্দ

ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ভারত সরকার প্রত্যেক বছরে ভারতীয় কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা (ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন-আইটিইসি) কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রস্তাব দিচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ৫০টি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে এসব স্বল্পমেয়াদী কোর্সের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বিষয় যেমন– একাউন্টিং, টেলিযোগাযোগ, ইংরেজি, ব্যবস্থাপনা, গ্রামোন্নয়ন ও অন্যান্য বিশেষায়িত কারিগরি কোর্স। ভারত সরকার ৩-৬ মাসের সংক্ষিপ্ত ও মাঝারি মেয়াদি এসব কোর্সের ব্যয়ভার বহন করে।

যোগ্যতা

আবেদনকারীর বয়স ২৫-৪৫ বছরের মধ্যে হবে এবং সরকারি-বেসরকারি বিশেষায়িত কোর্সের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, স্বনামধন্য কর্পোরেট হাউস বা বাণিজ্যিক সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিবর্গ এ কোর্সে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। ইংরেজির ব্যবহারিক জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

কিভাবে আবেদন করবেন

আইটিইসি-র যে-কোন কোর্সে আবেদন করতে হলে আবেদনকারীকে আইটিইসি-র https://itecgoi.in পোর্টালে গিয়ে নিজস্ব লগইন ও পাসওয়ার্ড তৈরি করে নিজেদের নাম রেজিস্টার করতে হবে। তারপর অনলাইনে মনোনীত কোর্সে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর আবেদনকারী ফরম ডাউনলোড করে আবেদনপত্রটি হাইকমিশন অফ ইন্ডিয়া, ঢাকা-য় ফরওয়ার্ড করবেন।

সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিকে অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশসহ আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। কোর্সের বিস্তারিত বিবরণ এবং আবেদনপত্র নিম্নলিখিত লিঙ্ক থেকে পাওয়া যাবে:- http://itec.mea.gov.in লিঙ্কগুলো ভারতীয় হাই কমিশনের ওয়েবসাইট www.hcidhaka.gov.in-এর Education & Training সেকশনেও পাওয়া যাচ্ছে। যে কোন তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন: fshoc@hcidhaka.gov.in এবং commerce@hcidhaka.gov.in

Training Programme in India

The Government of India offers the training courses under the India Technical and Economic Cooperation (ITEC) programme every year. The courses include diverse subjects such as Accounting, Telecommunication, English, Management, Rural Development and other specialized technical courses in over 50 reputed Institutions across India. These are short and medium term courses of between 3-6 months duration and are completely sponsored by the Government of India.

Eligibility

The applicants must be between 25-45 years of age and should have 5 yearsÕ relevant work experience in the area of specialized course in either Government or in a private organisation. They may belong to Government, Universities, reputed corporate houses or trade bodies. Working knowledge of English is essential.

How to apply

To apply for any ITEC course, the applicant must visit ITEC portal at https://itecgoi.in and register himself/herself by creating their own login and password. Thereafter, apply for the selected course online. After submitting the application form, the selected course online. After submitting the application form, the applicant should download the form and forward the application to the High Commission of India, Dhaka along with a letter of recommendation from the parent organisation of the applicant. Applicants working in the Government must approach the Economic Relations Division (ERD), Ministry of Finance or the Ministry of Foreign Affairs of the Government of Bangladesh for recommending the applications.

The details of courses on offer for the year and application forms can be downloaded at the following links :-

http://itec.mea.gov.in

The links are also available at the website of the High Commission of India at www.hcidhaka.gov.in under the Education & Training section.

Any queries may be addressed to fshoc@hcidhaka.gov.in & commerce@hcidhaka.gov.in

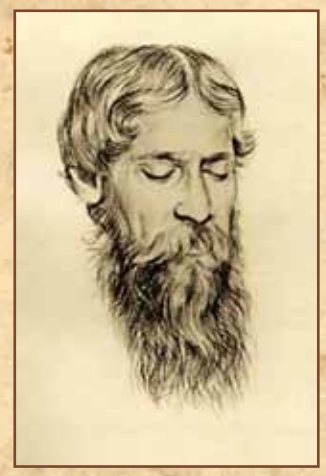

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাটক *রাজার* অনুবাদক ক্ষিতীশচন্দ্র সেন

সুরঞ্জন রায়

রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকের অনুবাদক হিসেবে যাঁর নাম জড়িয়ে আছে তিনি ক্ষিতীশচন্দ্র সেন (জ. ১৮৮৮)। তিনি ছিলেন আইসিএস অফিসার। কর্মসূত্রে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ২০ অক্টোবর বোম্বাই সরকারের অধীনে চাকরিতে যোগদান করলেও তিনি ছিলেন কালিয়া উপজেলার বড়কালিয়া গ্রামের সন্তান। তাঁর পিতা দুর্গাদাস সেনের সাত সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম কীর্তিমান। চাকরিসূত্রে বিলেত থেকে তিনি ভারতে আসেন ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ১৫ নভেম্বর। প্রথমদিকে তিনি বোম্বে হাইকোর্টের অ্যাপিলেটেড বিভাগের রেজিস্ট্রার ও আইন কমিটির সেক্রেটারি হলেও পরে বিচারপতি হন। তিনি এ কাজে সব মিলিয়ে বহাল ছিলেন ১৭ বছর ৮ মাস ১১ দিন।

এত সব থেকে অনুমান করা যায়, *রাজা* নাটকের অনুবাদের জন্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্ষিতীশচন্দ্র সেনের গড়ে উঠেছিল হার্দিক সম্পর্ক। এ সম্পর্ক কতখানি গভীর ও আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল সে বিষয়ে কিছুই জানা না গেলেও, ক্ষিতীশচন্দ্র যে ১৯১২ থেকে ১৯৩০ সাল জুড়ে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিলেন তা ধরা আছে রবীন্দ্রনাথের লেখা একাধিক চিঠির মধ্যে।

দুই.

রাজা রবীন্দ্রনাথের এক অনন্য সৃষ্টি। বিভিন্নজনের কাছে লেখা চিঠি থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক (ইন্দুলেখা চৌধুরীকে লেখা চিঠি ১২ কার্তিক ১৩১৭) ও ছাত্রদের অনুরোধে (চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি ১৭ কার্তিক ১৩১৭) নাটকটি রচনা করেন। নাটকটির কাহিনি তিনি সচেতনভাবে নিয়েছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২২-১৮৯৯) The Sanskrit Buddhist Story of Nepal গ্রন্থের Story of Kusa (pp.142-45) থেকে, কিন্তু নাটকটির আখ্যানভাগের সঙ্গে সংস্কৃতকাব্য *কুশাবদান*-এর বিস্ময়কর মিল আছে। এমনকি কুশাবদানের সুদর্শনার উক্তি ও রাজা নাটকের সুদর্শনার সংলাপের মধ্যে আছে অসম্ভব সাদৃশ্য। এরকম সাদৃশ্য সত্ত্বেও *রাজা* রবীন্দ্রনাথের একটি মৌলিক সৃষ্টি।

রাজা প্রকাশিত হয় ১৩১৭ সালের পৌষ মাসে। আর *The King of the Dark Chamber* শিরোনামের অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে। প্রকাশের সময় নাটকটির শিরোনাম, লেখক ও অনুবাদক হিসেবে লেখা হয়: *The King of the Dark Chamber* by Rabindranath Tagore, Translated into English by the Author (pp.177-237)। অনুবাদক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নাম থাকলেও ক্ষিতীশচন্দ্র সেনের নাম ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ *রাজা* কেন *মালিনী* ও *ডাকঘর*-এর অনুবাদও নিজে করেননি। *রাজার* অনুবাদ সম্পর্কে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ (১৬ অক্টোবর ১৯১২) লেখেন যে, কেমব্রিজের একজন ছাত্র *রাজা* অনুবাদ করছেন। ছাত্রটির নাম অনুল্লেখিত। তবে অনুবাদ শেষ করে ক্ষিতীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লেখেন:

> 'আমি যথাসাধ্য রাজার Literal তর্জমা করতে চেয়েছিলুম। অথচ জানতুম যে, সাহিত্যে তর্জমা এ রকম Literal আকারে প্রকাশিত হলে খুব উপভোগের বস্তু হয় না। প্রথম অনুবাদের উদ্দেশ্যটা এই রকম ছিল যে, আসলের রসটা যতটা সম্ভব সমগ্র ও অপরিবর্তিত আকারে ইংরেজির মধ্যে এনে উপস্থিত করা। তারপরে, ইংরেজি ভাষা ও চিত্তের প্রকৃতি ও গতি অনুসারে সেটাকে পিটিয়ে-সিটিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে একটা Organic সৌন্দর্যের মূর্ত্তি দেওয়া যেতে পারত। আমার সময় থাকলে আপনাকে পাঠাবার আগে হয়ত ঐ প্রথম খসড়াটাকে Base করে আর একটা খাতা তৈরি করতুম, কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল এ বিষয়ে যা কিছু করবার তা আপনার হাতেই হবে।'

অনুবাদক হিসেবে MACMILLAN POCKET TAGORE EDITION-এর ১৯৮০, এমনকি ১৯৮৩ ও ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের সংস্করণেও ক্ষিতীশচন্দ্রের নাম নেই। ফলে *রাজা* নাটকের অনুবাদের সূত্রে বাংলাদেশের কালিয়ার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে একটা যোগাযোগ সৃষ্টি হয়েছিল তা বরাবর অজ্ঞাতই রয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতীশচন্দ্র সেনের অনূদিত *The King of the Dark Chamber*-এর পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে *The Drama* (May 1914No.10) পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সে রকম অনুমতিও ছিল অনুবাদকের। অনুবাদক হিসেবে ক্ষিতীশচন্দ্রের নাম সেখানেও উল্লেখিত হয়নি। এর আগে *Nation* পত্রিকার সম্পাদক নাটকটি ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ক্রোড়পত্রে ছাপতে চাইলে ম্যাকমিলান কোম্পানির আপত্তির কারণে সম্ভব হয়নি।

ক্ষিতীশচন্দ্রের অনুবাদটি অভিনয়ের জন্যে রবীন্দ্রনাথ ডব্লিউ বি ইয়েটসকে দিয়েছিলেন। অভিনীতও হয়েছিল Little Theatre-এ। অভিনীত হওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথ নাটকটি ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে সন্ধেয় ২৬ নং গিলকট স্ট্রিটে লেডি ফ্লাওয়ারের বাড়িতে পড়ে শোনান। পাঠ শুনে Evelyn Underhill (স্টুয়ার্ট মুর-এর স্ত্রী) রবীন্দ্রনাথকে লেখেন:

`One thing specially struck me, even amongst all its beauties: I mean the episode of the King who went out to meet the great king on the battlefield, and fought like a brave man hardly anyone I think has told that before, & too many of our teachers of 'religion' spend their time in saying the exact opposite.'

ক্ষিতীশচন্দ্রের অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের শুধু ভাল লাগেনি, পাশ্চাত্যেও প্রশংসিত হয়েছিল। নাটকের সংলাপের অনুবাদের কথা বাদ দিলেও, বারোটি গানের অনুবাদ ক্ষিতীশচন্দ্রকে বাঁচিয়ে রাখবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দিয়ে যে *নন্দিনী*র অনুবাদও করাতে চেয়েছিলেন তা জানা যায় ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ অক্টোবর লেখা একটি চিঠি থেকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে খুব স্নেহ করতেন তাও জানা যায় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের একটি চিঠির মাধ্যমে। দিলীপকুমার রায়কে (১৮৯৭-১৯৮০) লেখা এ চিঠিতে ক্ষিতীশচন্দ্রের ওপর রাগ না করতে বারণ করেন রবীন্দ্রনাথ।

এত সব থেকে অনুমান করা যায়, *রাজা* নাটকের অনুবাদের জন্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্ষিতীশচন্দ্র সেনের গড়ে উঠেছিল হার্দিক সম্পর্ক। এ সম্পর্ক কতখানি গভীর ও আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল সে বিষয়ে কিছুই জানা না গেলেও, ক্ষিতীশচন্দ্র যে ১৯১২ থেকে ১৯৩০ সাল জুড়ে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিলেন তা ধরা আছে রবীন্দ্রনাথের লেখা একাধিক চিঠির মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের অন্য কোন গ্রন্থ ক্ষিতীশচন্দ্র অনুবাদ করেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। তবে ঋষি অরবিন্দকে (১৮৭২-১৯৫০) নিয়ে লেখা 'নমস্কার' কবিতাটির সমিল অনুবাদ করেন ক্ষিতীশচন্দ্র। অনুবাদটি:

`Rabindranath, O Aurobindo, bows to thee!
O friend, my country's friend, O voice incarnate free, of Indian's soul! No soft renown doth crown thy lot, Nor pelf or careless comfort is for thee; thou'st sought, Nor petty bounty, petty dole; the beggar's bowl. Thou ne'er hast held aloft.'

এ ছাড়া, ক্ষিতীশচন্দ্র থিওডোসিয়া টমসনের সঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ করেন। অনুবাদটি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

তিন.

রবীন্দ্রনাথের *গীতাঞ্জলি*র ওপর ডব্লিউ বি ইয়েটস যেভাবে কলম বুলিয়েছিলেন, ক্ষিতীশচন্দ্রের *The King of the Dark Chamber*- এর বেলায় রবীন্দ্রনাথ কতখানি পরিবর্তন পরিবর্ধন বা সংযোজন করেছিলেন তা জানা যায়নি। যদি ধরে নেওয়া হয় এটি সম্পূর্ণ ক্ষিতীশচন্দ্রের অবদান, তাহলে দেখতে পাবো তিনি এ নাটকের অনেক সংলাপ বর্জন করেছেন। কুড়িটি অঙ্ক মিলে এ নাটকের সংলাপ প্রায় ৮৪৫টি। অনূদিত হয়েছে ৬৮৮টি। বাকি ১৫৭টি সংলাপসহ অনূদিত হয়নি ২৬টি গানের

রবীন্দ্রনাথের *রাজা* কালিয়া জনপদের প্রথম আইসিএস ক্ষিতীশচন্দ্র সেনের হাতে The King of the Dark Chamber নামে ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছিল। এ সত্যতা প্রমাণিত হলেও, কেন যে অনুবাদক ক্ষিতীশচন্দ্রের কোন স্বীকৃতি মেলেনি সেটিই একটি বড় জিজ্ঞাসা।

মধ্যে ১৪টি গান। রবীন্দ্রনাথ মূল রাজা নাটকে যেভাবে অঙ্ক সাজিয়েছেন, ক্ষিতীশচন্দ্র অনুবাদের সময় সেখানে একটু ভিন্নতা এনেছেন। তিনি *The King of the Dark Chamber* শুরু করেছেন *রাজা*র দ্বিতীয় অঙ্ক দিয়ে।

সেক্ষেত্রে প্রথম অঙ্ক হয়েছে দ্বিতীয় অঙ্ক। বাকি অঙ্কগুলো যথাযথ রাখা হয়েছে। রাজার দ্বিতীয় অঙ্কের সংলাপ সংখ্যা ১৩৫টি। অনূদিত হয়েছে ১২০টি। অপরপক্ষে, রাজার প্রথম অঙ্কের ৮৬টি সংলাপের মধ্যে অনুবাদে দ্বিতীয় অঙ্ক হিসেবে অনূদিত হয়েছে ৬৫টি। তৃতীয় অঙ্কে ঠাকুরদার সংলাপ ও 'আজি কমল মুকুলদল খুলিল' গানটি বাদ দিয়ে অনুবাদ শুরু হয়েছে। এ অঙ্কে ৯২টি সংলাপের মধ্যে অনূদিত হয়েছে ৬৫টি, আর 'মোদের কিছু নাইরে নাই' (We have nothing indeed we have nothing at all) গানটি অনূদিত হলেও, অনূদিত হয় নি 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে' ও 'বসন্তে কি কেবল ফোটা ফুলের মেলা' গান দু'টি।

চতুর্থ অঙ্কে সুদর্শনা ও রোহিনীর দু'টি সংলাপ বাদ দিয়ে অনুবাদ শুরু হলেও, ৪৩টি সংলাপের মধ্যে অনূদিত হয়েছে ৩৮টি। এ অঙ্কে:

বিরহ মধুর হল আজি মধুরাতে।
গভীর রাগিনী উঠে বাজি বেদনাতে।
ভরি দিয়া পূর্ণিমা নিশা
অধীর অদর্শনতৃষা
কী করুণ মরীচিকা আনে
আঁখি পাতে।

ক্ষিতীশচন্দ্র কৃত গানটির অনুবাদ:

My sorrow is sweet to me in this spring night.
My pain smites at the chords of my love
and softly sings
Visions take birth from yearning eyes
and flit in the moonlit sky.

*রাজা*র পঞ্চম অঙ্কের ৫৮টির মধ্যে ২০টি সংলাপ আর বাউলদের গান 'যা ছিল কালো ধলো', ঠাকুরদার গান 'আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা', 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি', 'আমার ঘুর লেগেছে– তাধিন তাধিন', সুরঙ্গমার 'পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে' গানগুলোর মধ্যে প্রথম দু'টি অনূদিত হয়েছে। 'আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা' গানটির অনুবাদ:

With you is my game, love, my love!
My heart is mad, it will never own
defeat,
Do you think you will escape stainless
yourself reddening me with red
powder?
Could I not colour your robe with the
red pollens of the blossom of my
heart?

ষষ্ঠ অঙ্কের ২৮টি, সপ্তম অঙ্কের ২১টি ও অষ্টম অঙ্কের ৫টি সংলাপ অনুবাদে রক্ষিত হয়েছে। তবে অষ্টম অঙ্কের 'ভয়েরে মোর আঘাত করো' গানটি ছাড়া রাজার 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না', ও সুরঙ্গমার 'আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী' গান দু'টি অনূদিত হয়নি।

নবম অঙ্কের ১১টি ও দশম অঙ্কের ৩১টি সংলাপ অনূদিত হয়েছে শুধু সুরঙ্গমার 'আমি কেবল তোমার দাসী' গানটি ছাড়া। একাদশ অঙ্কের ৪৪টির মধ্যে ২৫টি, কিন্তু দ্বাদশ অঙ্কের ২৭টিই অনূদিত হয়েছে। ত্রয়োদশ অঙ্কে ২৫টির মধ্যে ৮টি অনূদিত হয়েছে। অঙ্কটি বন্দী কান্যকুব্জরাজ, অন্যান্য রাজগণ ও সুবর্ণ-র উপস্থিতিতে শুরু হলেও, অনুবাদে "KING OF KANCHI and SUVARNA"-র মধ্যে সংকুচিত করা হয়েছে। ফলে কলিঙ্গ, বিদর্ভ, কোশল ও কান্যকুব্জের রাজার কোন সংলাপ তো অনূদিত হয়ইনি; পরন্তু ঘটনা অনুযায়ী সুবর্ণর দুটি ও কাঞ্চীর একটি সংলাপ অনুবাদক রচনা করে দিয়েছেন। চতুর্দশ অঙ্কের ১৮টি সংলাপ অনূদিত হলেও, সুদর্শনার 'এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে' গানটি অনূদিত হয়নি। পঞ্চদশ অঙ্কের ৬৫টির মধ্যে ৬০টি, ষোড়শ অঙ্কের ৩১টির মধ্যে ২৬টি, সপ্তদশ অঙ্কের ২৩টির মধ্যে ২৩টি এবং অষ্টাদশ অঙ্কের ১৫টির মধ্যে ১১টি সংলাপের অনুবাদ হয়েছে। অষ্টাদশ অঙ্কের 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' গানটি অনুবাদক অনুবাদ না করে পঞ্চম অঙ্কের ঠাকুরদার 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়।/ আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যে জন ভাসায়।/ যে জন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে– ভালোবাসে আড়াল থেকে–/ আমার মন মজেছে সেই গভীরের গোপন ভালোবাসায়' গানটি এ অঙ্কে সংযোগ সাপেক্ষে অনুবাদ করেছেন। অনুবাদটি:

I am waiting with my all in the hope of
losing everything.
I am watching at the roadside for him
who turns one out into the open
road,
Who hides himself and sees, who loves
you unknown to you,
I have given my heart in secret love to
him,
I am waiting with my all in the hope of
losing everything.

এ গানটির সংযোজন এ অঙ্কটিকে শুধু নয়, গোটা অনুবাদটির প্রাণসঞ্চার করেছে। উনবিংশ অঙ্কের ৩১টি সংলাপের মধ্যে ৩০টি অনূদিত হলেও, সুরঙ্গমার দু'টি গান: 'অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে' ও 'ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান' অনূদিত হয়নি। বিংশতি অঙ্কের ৭টি সংলাপ অনুবাদের মধ্য দিয়ে ক্ষিতীশচন্দ্র সেন তাঁর *The King of the Dark Chamber* শেষ করেন। মূল নাটকে *রাজা* ও সুদর্শনার সর্বশেষ সংলাপ:

রাজা। আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম–
এখানকার লীলা শেষ হল। এসো, এবার আমার সঙ্গে এসো,
বাইরে চলে এসো– আলোয়।
সুদর্শনা। যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে, আমার নিষ্ঠুরকে,
আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।

ক্ষিতীশচন্দ্রের অনুবাদ:

King
I open the doors of this dark room
to-day –the game is finished here?
Come, come with me now, come out-
side – into the light!
Sudarshana
Before I go, let me bow at the feet
of my lord of darkness, my cruel, my
terrible, my peerless one!

রবীন্দ্রনাথের *রাজা* কালিয়া জনপদের প্রথম আইসিএস ক্ষিতীশচন্দ্র সেনের হাতে *The King of the Dark Chamber* নামে ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছিল। এ সত্যতা প্রমাণিত হলেও, কেন যে অনুবাদক ক্ষিতীশচন্দ্রের কোন স্বীকৃতি মেলেনি সেটিই একটি বড় জিজ্ঞাসা।

সুরঞ্জন রায়
শিক্ষাবিদ প্রাবন্ধিক

সম্প্রীতি

এক সুরে গাই গান

করুণাসিন্ধু দাস

কয়েক বছর আগে ভারতের এক বাংলাভাষী কবি দীপক ঘোষ ‘রাজনীতি লীলামৃতম্’ নামে সংস্কৃত ভাষায় একটি স্যাটায়ারধর্মী কাব্য লিখেছিলেন। অশুভ বিভেদপন্থা ও তার কুফল বলতে গিয়ে কবি সেখানে প্রশ্ন তুলেছিলেন– ‘উত্তোলিতা কণ্টকসীমারেখা/দ্বিধা বিভিন্নাঃ কিমু তে জনাস্ ত্বয়া/ ধর্মধ্বজে তদ্ বদ ভেদনীতে।’ বুঝতে অসুবিধা নেই, ঐক্য আর সম্প্রীতির সূত্র খুঁজে সবার জন্য স্বস্তির আশ্বাস চাইছেন এখানে তিনি। তিনি আরও বলেছেন–

‘একা নদী পর্বত এক এব.../ একো হি সূর্যোপি চন্দ্র এক.../ অদ্বৈতম্ একং খলু সর্বম্ এতত্/ একৈব ভাষা যদি ভাবনৈকা/ সাহিত্যসংবেদনম্ একম্ এব/ ...শিল্পং তথা সংস্কৃতিরেকরূপা/ ... কণ্ঠচ্যুতৈকা মধুরা খগানাম্/ ...পুষ্পচ্যুতং সৌরভম্ একম্ এব।’

অতএব, তাৎপর্য হল, ‘যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ’।

আকস্মিক মহাপ্রাপ্তি

বক্ষ্যমাণ নিবন্ধটি আমাদের কাছে আকস্মিকভাবে চলে আসে অধ্যাপক দুলাল ভৌমিকের সৌজন্যে। অধ্যাপক ড. করুণাসিন্ধু দাসের এই লেখাটি নাকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বারান্দায় কোন এক ছাত্র কুড়িয়ে পান। সম্ভবত এটিই তাঁর শেষ লেখা। লেখাটি প্রকাশ করতে পেরে আমাদের মন একইসঙ্গে হর্ষ ও বিষাদে আক্রান্ত। কারণ, ইতোমধ্যে অধ্যাপক দাস আমাদের ছেড়ে অনন্তের পথে পা বাড়িয়েছেন ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ এপ্রিল (২ বৈশাখ ১৪২২) কলকাতায় বার্ধক্যজনিত কারণে।

প্রখ্যাত গবেষক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব রবীন্দ্র-অধ্যাপক ড. করুণাসিন্ধু দাসের জন্ম ১৯৪৭ সালে বিভক্ত ভারতের বীরভূমে। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ এবং পি এইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ভাষা, ব্যাকরণ, সংস্কৃত ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তাঁর প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা ৩০।

২০০৭ থেকে '১২ সাল পর্যন্ত কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালনের পর অধ্যাপক দাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র-অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। এ সময়কালে তিনি বাংলা, ইংরেজি, দর্শন, ভাষা বিজ্ঞান, সংগীত, সংস্কৃত বিভাগ এবং চারুকলা অনুষদের সঙ্গে নানা একাডেমিক গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। ঢাকায় অবস্থানকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপিচর্চা এবং পাণ্ডুলিপিচর্চাকারীদের উদ্বুদ্ধকরণে আয়োজিত প্রশিক্ষণে মুখ্য প্রশিক্ষক হিসেবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাসূত্রেই তিনি রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা প্রদান, সেমিনারে অংশগ্রহণ ও গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে জ্ঞান বিকাশে প্রভূত অবদান রেখে গেছেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ভারত উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমান-এর বহু শতাব্দীপ্রাচীন সহাবস্থানকে যে 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম' বলেছিলেন, ব্যাপকতর অর্থে তার সৌরভ আস্বাদনে তাই যেন ভুল না করি। 'একই আকাশ-মায়ের কোলে', একই মাটির পাদপীঠে, একই সংস্কৃতির বিতানে যাদের দেহ, মন, ভাব-ভাবনার বিকাশ তাদের মৈত্রী বিধির বিধান। তা মানতে যদি কারও সংশয় থাকে, প্রকৃতির আশীর্বাদ বলতে কেউ দ্বিমত হবেন না। বাংলাদেশ-ভারত সম্প্রীতি পরিষদ এই বোধের আলোকশিখা। সংস্কৃতির চেয়ে বড় মৈত্রীভূমি বোধহয় নেই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে; ভৌগোলিক-প্রশাসনিক নানা যোগবিয়োগ নানা শাসনামলে ঘটলেও অবিচ্ছিন্ন বহুত্ববাদী সংস্কৃতির ধারা এই উপমহাদেশকে একটি অখণ্ড একক গণ্য করেছে বহু শতক ধরে। *গীতাঞ্জলির* 'ভারততীর্থ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বতোমুখ স্বদেশ, 'ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর নদী-জগমালা-ধৃত প্রান্তর' তারই বন্দনা করেছেন। 'হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন–/ শক-হুন-দল পাঠান মোগল একদেহে হল লীন। ... তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে কেহ নহে নহে দূর/ আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর।'

আমার জন্ম ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর খণ্ডিত ভারতের পশ্চিমবঙ্গে। অখণ্ড ভারতের বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু অখণ্ড সংস্কৃতির চালচিত্র বুঝতে কখনও অসুবিধা দেখি না। ধরা যাক 'দুই বিঘা জমি'-র উপেনের চোখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বঙ্গদর্শন প্রসঙ্গটি। 'নমো নমো নমো সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি' কোন্ বঙ্গের কথা, যার স্মরণে 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান চোখে আসে জল ভরে'? 'গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি' কোন খণ্ডিত প্রদেশের খণ্ডিত জলপ্রবাহ নিয়ে নয়। 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি/ পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলা-গেহ/ স্তব্ধ অতল দীঘি-কালো-জল নিশীথ-শীতল স্নেহ/ বুক ভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ধরে।' 'ছাড়ি হাটখোলা নন্দীর গোলা মন্দির করি পাছে' কোথায় পৌঁছাই আমরা? রবীন্দ্রনাথ গ্রাম দেখেছেন জমিদারির সুবাদে পূর্ববঙ্গে ঝিনাইদহ-শাজাদপুর-পতিসরে, নদীর সঙ্গে ভাব করেছেন পেনেটি চন্দন নগরের ভাগীরথীতে, পূর্ববঙ্গের পদ্মায়, পশ্চিম রাঢ়ের শীর্ণকায়া কোপাই-এ। ভারত ভেঙে ভাগ করা বাংলায় 'কোথায় পাব তারে'?

মাঝে মাঝে ভাবি, 'এ কী গো বিস্ময়', একই ভাষায় একই কবির একই গান একই সুরে উভয় প্রান্তে মানুষ গাইছেন আপন আপন জন্মভূমির বন্দনায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার কথা মনে পড়ে। বেতারে একদিন প্রচারিত হতে শুনেছিলাম 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' দু'জন শিল্পীর কণ্ঠে পরপর– একজন ভারতের সুচিত্রা মিত্র অন্যজন অবশ্যই স্বাধীন বাংলাদেশের। সম্প্রতি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে ঢাকায় তাঁর স্বদেশগীতি শুনতে শুনতে একই উপলব্ধি হল– 'বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ/ ...দেবী আমার, সাধনা আমার ...।' কিংবা, 'ধন-ধান্য-পুষ্প-ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা/ ... ভায়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ, ওমা তোমার চরণ-দুটি বক্ষে আমার ধরি।' পুরুলিয়ায় হোক, চট্টগ্রামে হোক, বুঝতে এতটুকু তফাৎ হয় না– 'মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো/ মা তো বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়নজলে ভাসি।' বাহান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি এইভাবে বাংলাদেশ-ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে পৃথিবীর তাবৎ ভাষাভাষী মানুষের মাতৃভাষা দিবস হয়ে এই সত্যের বিশ্বজনীন প্রতীকরূপ লাভ করেছে। বাংলার ভাষা-শহীদ সর্বজনের ভাষা-শহীদের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছেন।

সাংস্কৃতিক অখণ্ডতার ঐতিহ্য সকলের উত্তরাধিকার। তা সে খণ্ডিত উপমহাদেশের যে অংশ থেকেই বিকাশ লাভ করুক না কেন। পাণিনি, গৌতম বুদ্ধ, অতীশ দীপঙ্কর, সম্রাট অশোক, আকবর, চৈতন্য দেব, নানক, কবীর, লালন সাঁই কোন অঞ্চলে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তথ্যের জন্য তা আবশ্যক হলেও স্থান, প্রদেশ, এলাকা ছাড়িয়ে 'সর্বজনের মনের মাঝে' তাঁদের আসন পাতা। তক্ষশিলা তাম্রলিপ্ত, পাহাড়পুর, জগদ্দল, নালন্দা এই অর্থে সর্বজনীন প্রতীক। ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস অনুশীলনে-চর্চায় আমরা সকলে সকলের পরিপূরক, এই বোধ আবশ্যক। নাহলে সত্যের পূর্ণরূপ অনুধাবন অসম্ভব থেকে যায়। দু'একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যাক। ভারত উপমহাদেশ প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সম্ভারের দিক থেকে পৃথিবীর সমৃদ্ধতম অঞ্চল। আড়াই হাজার বছরের বেশি সময় ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার চর্চা, উদ্ভাবন, গ্রন্থ রচনা এখানে হয়ে এসেছে। জ্ঞান কখনও উদ্ভব স্থানে আবদ্ধ থাকে না। তিব্বতের পথে এখানকার অসংখ্য গ্রন্থ ও তার অনুবাদ চীন, মঙ্গোলিয়া, জাপান, কোরিয়া পর্যন্ত পৌঁছেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতেও তার প্রসার ঘটেছে। পশ্চিম এশিয়া ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের ফলে দুই ঐতিহ্যের সঙ্গমে নতুন একটি আলোকিত সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছে। সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতি সমন্বয়ের এইসব দিকগুলো উদ্‌ঘাটনের জন্য যাবতীয় ভাষায় লেখা সব পাণ্ডুলিপি উদ্ধার, রক্ষণাবেক্ষণ, পঞ্জীকরণ, পাঠোদ্ধার ও সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশ জরুরি। এশিয়ার সুমহান ঐতিহ্য সারা মানবজাতির স্বার্থেই চর্চা করা দরকার। সম্প্রতি ভারত সরকারের জাতীয় পাণ্ডুলিপি মিশন ভারতখণ্ডে রক্ষিত কয়েক লক্ষ পাণ্ডুলিপির সমীক্ষা, পঞ্জীকরণ ও রক্ষণব্যবস্থা করেছেন। শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশসহ অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলিতে এই কাজ না হলে উদ্যোগটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

ভারত ভাগের ফলে এমন ঘটেছে যে বহুপরিবারের কিছু অংশ সীমান্তের এপ্রান্তে কিছু অংশ ওপ্রান্তে থাকছেন। পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রেও এটা ঘটেছে। যেমন, ন্যায়পঞ্চাননের লেখা *ব্যাকরণদীপিকা* নামে একটি গ্রন্থের খবর জানি যার 'কারক' অংশটি এখন আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে, 'সন্ধি' অংশটি কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে আর সমাস, তদ্ধিত ও সুবন্ত অংশগুলি আছে ভারতের মেদিনীপুরের বাসুদেবপুর গ্রামে পঞ্চানন রায় স্মারক পুথিশালায়।

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আলী আহমদ, আহমদ শরীফ আরও সমৃদ্ধ করেছেন এ তথ্যভাণ্ডার। মধ্যযুগে ধর্ম ও শাস্ত্রচর্চা প্রাচীন ধ্রুপদী ভাষায় হওয়া উচিত, নাকি লোকসাধারণের গ্রাহ্য ভাষায়– এই সংশয় ও বিতর্ক প্রবল ছিল। জানা যায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত বাংলা ভাষায় লেখা বলে প্রথমদিকে আচার্যরা তা প্রচারের অনুমতি দেননি। মুসলমান সমাজেও এই দ্বিধা ছিল।

সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও সহয়োগ ছাড়া এই রত্নসন্ধান কিভাবে সম্ভব?

এই প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাস পুনরুদ্ধার নিয়ে দু'এক কথা না বললেই নয়। বহুকাল পর্যন্ত এই ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল দিক অনাবিষ্কৃত থাকায় আমাদের জ্ঞান ছিল একান্ত খণ্ডিত। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে দেড় শতাধিক কবিকে বিস্মৃতির অতল থেকে আবিষ্কার করে আমাদের অজ্ঞানমুক্তি ঘটিয়েছেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আলী আহমদ, আহমদ শরীফ আরও সমৃদ্ধ করেছেন এ তথ্যভাণ্ডার। মধ্যযুগে ধর্ম ও শাস্ত্রচর্চা প্রাচীন ধ্রুপদী ভাষায় হওয়া উচিত, নাকি লোকসাধারণের গ্রাহ্য ভাষায়– এই সংশয় ও বিতর্ক প্রবল ছিল। জানা যায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্যচরিতামৃত* বাংলা ভাষায় লেখা বলে প্রথমদিকে আচার্যরা তা প্রচারের অনুমতি দেননি। মুসলমান সমাজেও এই দ্বিধা ছিল। আমাদের বিস্ময় ও গর্বের কথা, *ওফাতে রসুল* গ্রন্থে কবি সৈয়দ সুলতান মাতৃভাষার পক্ষে লেখেন–

যারে যেই ভাষে প্রভু করিছে সৃজন।
সেই ভাষ তাহার অমূল্য সেই ধন ॥

আর, আবদুল হাকিম তাঁর *নূরনামায়* আরেক ধাপ এগিয়ে বলেন–

যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবানি।
সেসব কাহার জন্ম নির্নএ না জানি ॥
দেশী ভাষা বিদ্যা জার মনে না যুয়াএ।
নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশে না যাএ ॥
মাতা পিতামহ ক্রেমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত য়তি ॥

উল্লিখিত *ওফাতে রসুল* ও *নূরনামা* সম্পাদিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে মাত্র ১৯৪৯ ও ১৯৭০ সালে। এই গ্রন্থ দুটি আবিষ্কার না হলে কি জানা যেত, অতুলপ্রসাদ সেন-এর 'আমরি বাংলা ভাষা', মাইকেল মধুসূদনের 'মাতৃভাষা-রূপ খনি পূর্ণ মণিজালে', কিংবা রামনিধি গুপ্তের 'নানান দেশের নানান ভাষা/বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা'-র সরণী বেয়ে আরও দুই-তিন শতাব্দী পিছিয়ে গেলে 'মাতৃ-কোষে রতনের রাজি' এমন উজ্জ্বল বিভায় বিরাজ করছে? একুশের ভাষা-আন্দোলন বেয়ে বিকীর্ণ ছটা একাত্তরে এসে নবজাতক স্বাধীন বাংলাদেশের কপালে মায়ের আশিস্ চুম্বন ও জয়টীকা পরিয়ে দিয়েছে।

করুণাসিন্ধু দাস
প্রয়াত উপাচার্য, রবীন্দ্র-অধ্যাপক

বাংলাদেশ-ভারত
মৈত্রী সমিতি

হোমটাউন প্রজেক্ট, লেভেল # ১৬, সুট # ১৫বি
৮৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
E-mail: info@bifs.org.bd, b_ifs@yahoo.com
(জিপিও বক্স # ৭৭৫)
ওয়েবসাইট: www.bifs.org.bd

ABSSI
Association of Bangladeshi Students Studied in India

ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভকারী শিক্ষার্থী সমিতি
President: Dr. Dalem Chandra Barman
VC, ASA University, Dhaka
Phone: 01552 334300
Secretary: Shamim Al-Mamun
Phone: 01715 902146

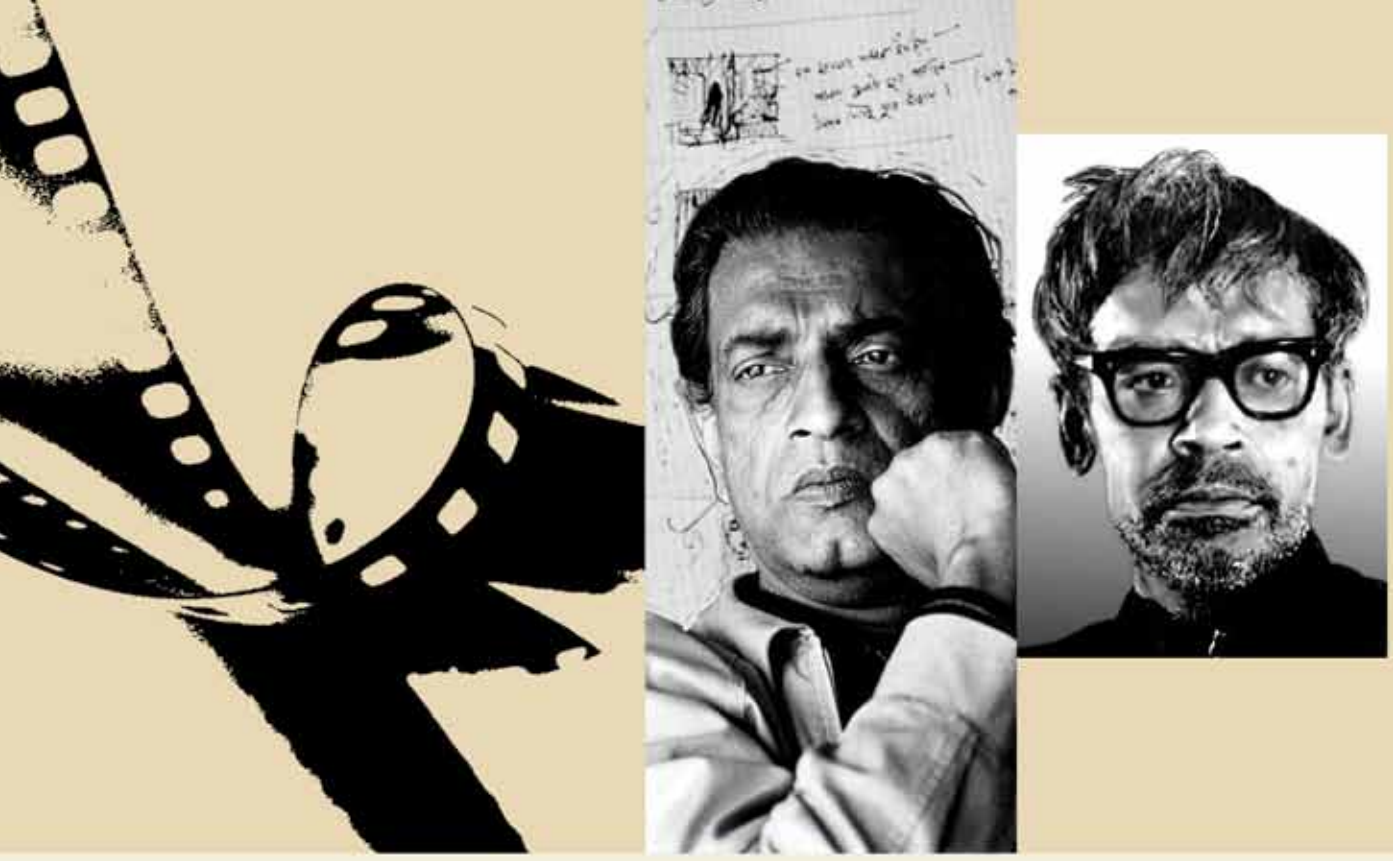

প্রবন্ধ

সত্যজিৎ ও ঋত্বিক

দেখার রকমফের

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

বৈশাখে-শ্রাবণে, নিদাঘে-প্লাবনে যূথীবনের দীর্ঘশ্বাসে ও রিক্ত রাজপথে যে তারা কত আলাদা! এক দশকে ভিন্ন দুই শিল্পী ধারণ করে রইলেন আমাদের আধুনিকতা: এই মৈত্রী, এই মনান্তর, বিপর্যয় ও সাম্যে। সত্যজিৎ রায় ও ঋত্বিক ঘটকের চোখ কত দূরে চলে যায় পরস্পরের থেকে, *অযান্ত্রিক* চলচ্চিত্রটি যে গাড়ি চালকটিকে ব্যবহার করে (১৯৫৭) তাকেই সত্যজিৎ অনেক ভিন্ন তাৎপর্যে উৎকীর্ণ দেখতে পান *অভিযান* ছবিতে (১৯৬২), আমার তো মনে হয় ঋত্বিক যখন ইতিহাসের দিকে চোখ মেলে দেন নিরভিমান, তখন সত্যজিৎ অনুপুঙ্খে আখ্যান-প্রেমিক। *পথের পাঁচালী* (১৯৫৫)-তে দুর্গার একটি বৃষ্টিভেজা লো-অ্যাঙ্গেল শট বারবার আবর্তিত হয়েছে নীতার মধ্যে *মেঘে ঢাকা তারায়* (১৯৬০), যে নৈশাভিযান *সুবর্ণরেখায়* (১৯৬২) ঈশ্বরের, তার সঙ্গে *জন-অরণ্য* (১৯৭৫) ছবির সোমনাথের পার্থক্য মৌলিক, একজন যদি দর্শনের সমুদ্রে অভিযাত্রী হন অন্যজন তবে দৃশ্য ও শ্রবণের কারুপ্রতিমা। এমন এই দু'জন, যেন বিপরীতমুখী পিতামাতা– আমাদের চলচ্চিত্র চেতনার, যেন আধুনিকতার মুহূর্তটিতে হর-গৌরী মিলন। বাস্তবিক ভুললে চলবে না যখন আমাদের সিনেমার আধুনিকতা ভূমিষ্ঠ হল, সিনেমাকে শিল্প ভাবার পরিসর তৈরি হল, তখনই যেন অলৌকিক সমাপতন, সিনেমার জনপ্রিয়তাও নবীন নাগরিকের সঙ্গে অন্যরকম করমর্দনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

১৯৫৫ সাল; একই সঙ্গে *শাপমোচন* ও *পথের পাঁচালী* মুক্তি পেল। উত্তমকুমারের শহরে আসাকে আমরা *অযান্ত্রিকের* বিমলের মোটরগাড়ি ও প্রীতি ও *অপরাজিততে* যুবক অপূর্বকুমার রায়ের শাহরিক চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে পারি।

এ পর্যন্ত বোঝা যায় যে প্রগতি, উন্নয়ন অর্থাৎ ইতিহাসের বড়ো পরিপ্রেক্ষিত ঋত্বিক ও সত্যজিৎ ভিন্নভাবে অনুমান করেন। বলতেই পারি যে আধুনিক দৃষ্টিতে এ ধরনের সংকট থাকা অস্বাভাবিক নয়। সত্যজিতের অপূর্বকুমার রায় যে-অর্থে বিজ্ঞানের

প্রায়োগিক দিককে আলোকপ্রাপ্তির নিশানা মনে করে, *সুবর্ণরেখার* ঈশ্বর চক্রবর্তী দুস্তর ব্যবধান থেকে গ্যাগারিনের মহাকাশ বিজয়কে উপেক্ষা না করলেও প্রান্তিক সত্যের অতিরিক্ত দাম দিতে চান না। *সুবর্ণরেখা* ইতিহাসের নিম্নবর্গীয় কথামালাকে ষাট দশকের শুরুতেই প্রতিষ্ঠা করে। *সুবর্ণরেখার* রামায়ণকথা মোটেই ইক্ষ্বাকু বংশীয়া রাজমাতা কৌশল্যার নয়, এক বাগদি বউয়ের, এবং তিনি অযোধ্যার রাজান্তঃপুরবাসিনী নন; তাকে ঋত্বিক নিবেদন করেছেন খররৌদ্রে, জনপরিসরে, ঘাটশিলার স্টেশন চত্বরে। ফলে রামচন্দ্রের মাতৃ-দর্শন ঋত্বিকের ক্ষেত্রে মহাকাব্যের সংগঠন নয় বরং এক উদ্দেশ্যমূলক নাশকতা যা ঘটনাক্রমে পুরাণকথার ক্ষতমুখ খুলে দিয়েছে। সত্যজিৎ সেদিক দিয়ে বড়জোর একজন সংশোধন-প্রত্যাশী মানবতাবাদী। *সদ্‌গতি*-তে তাঁর অস্পৃশ্য নায়ক আমাদের হৃদয়ের সংস্কার দাবি করে। আর *শতরঞ্জ কে খিলাড়ি*তে লর্ড ডালহৌসির সেনাদলের প্রতি তার অনুচ্চারিত অভিমান ইতিহাসের বাইরে, শীতার্ত দিগন্তরেখার নিচে দাঁড়িয়ে থাকা এক নিষ্পাপ বালকের চোখে। নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্-র সুরেলা অবক্ষয়ে আমরা ব্যথা পাই কিন্তু সত্যজিতের ইতিহাসবোধ তাঁকে আখ্যান-অতিরিক্ত প্রত্যাঘাতে উৎসাহ দেয় না।

এ পর্যন্ত যে স্বভাবগত পার্থক্যের কথা বলা হল তা উভয় স্রষ্টার কাহিনিচিত্রকে বিবেচনা করেছে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করি যে, দেখার এই রকমফের অত্যন্ত মৌলিক আর তা এমনকি তথ্যচিত্রের আপাত কঠিন নির্মাণেও ডালপালা ছড়িয়েছে। আমি সত্যজিৎ রায়কৃত চিত্রকর বিনোদবিহারীকে ভিত্তি করে তোলা *দি ইনার আই* (১৯৭২) ও রামকিঙ্কর বেইজকে নির্ভর করে ঋত্বিক ঘটকের অসমাপ্ত প্রকল্পটির (১৯৭৫) দৃশ্যবিন্যাস নিয়ে কথা বলতে চাইছি। কীভাবে ব্যাখ্যা করব বিপরীত দৃষ্টিকোণের এই তাৎপর্য? কেন তিনি, ঋত্বিক ঘটক, রামকিঙ্করে আকৃষ্ট হয়েছিলেন? শুধু এই জন্য কি যে সত্যজিৎ রায় অল্প কিছুদিন আগে বেছে নিয়েছিলেন বিনোদবিহারীকে যেখানে স্থিতির সুষমা, ঋত্বিক তাই রামকিঙ্করকেই খুঁজে নিলেন তাঁর ফ্রেমে, গতির নৈরাজ্যে। কী আশ্চর্য! বিনোদবিহারীর অন্তর্গত প্রশান্তি আকর্ষণ করেছিল সত্যজিৎকে, আর ঋত্বিককে টেনেছিল রামকিঙ্করের অভ্যন্তরীণ অশান্তি। আসলে এই তথ্যচিত্র দুটি পরীক্ষা করলেই দেখা যায় বাস্তববাদ বিষয়ে, শিল্পের উৎস ও আকাঙ্ক্ষা বিষয়ে, সত্যজিৎ ও ঋত্বিকের ধারণাগত মিল ও অমিল।

অন্তরে আজ দেখব যখন আলোক নাহিরে

একটু গভীরভাবে দেখলেই আমরা নিশ্চিত হই, সত্যজিতের বিনোদবিহারী তথ্যের উপাদান, কিন্তু সত্যজিৎ মোটেই বিনোদবিহারীর জীবনীরচনায় আগ্রহী নন। বরং একজন চলচ্চিত্রকারও যেহেতু মূলত দৃশ্যশিল্পী, বিনোদবিহারীর মধ্যে সত্যজিৎ রায় পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন দৃশ্যভাষার মাত্রা ও অনুষঙ্গসমূহ। বলাবাহুল্য, চল্লিশের দশকের শুরুতে যে চিত্রকরকে তিনি মাস্টারমশাই হিসেবে পেয়েছিলেন তিনি এবং সত্তর দশকের বিনোদবিহারীর মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। একদা যিনি ক্ষীণদৃষ্টি ছিলেন, তিনি দৃষ্টিহীনে পরিণত হয়েছেন, সুতরাং সত্যজিতের পক্ষে উৎসুক হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক যে, দৃশ্যের বস্তুগত দিক একজন শিল্পীর পক্ষে কতটা প্রয়োজনীয়।

মনে রাখা জরুরি যে, *পথের পাঁচালী* থেকেই সত্যজিৎ বাস্তবতাকে মিলিয়ে দিতে চাইছিলেন অনুভূতির অন্য মাত্রায়, হয়তো সংগীতে। আর সেই জন্যেই, নিজেরও প্রাথমিক ভিত্তি স্পেস বা স্থান বলেই সত্যজিৎ বুঝতে চেয়েছিলেন তাঁর অন্ধ মাস্টারমশাই স্থানকে কিভাবে বুঝতে চান। এই ছবিতেই বিনোদবিহারী তাঁকে জানান, স্পেস সম্পর্কে একটা নতুন চেতনা। স্পেসটা হয়ে যায় একটা ঘনবস্তু– যেটাকে হাত দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে সামনে এগোতে হয়। যে জিনিসটা স্পর্শ করছি, সেটা ছাড়া আর কোনকিছুর অস্তিত্বই থাকে না, তোমরা চেয়ার দেখলেই বুঝতে পারছ সেটা আছে, আমি চেয়ারে বসলে পরে তবে বুঝছি, সেটা আছে... এছাড়া আবার আরেকটা দিকও আছে। এই যে চায়ের গেলাসটা হাতে নিলুম– কাচ জিনিসটার স্পর্শগত অনুভূতি কোনদিন আগে এভাবে ফিল করিনি (বিনোদদা, *বিষয় চলচ্চিত্র*)। অর্থাৎ সত্যজিৎ রায় নিজেকে বোঝাতে চাইছেন যে, বাস্তবতা সম্পর্কে প্রচলিত সংস্কারের সীমানা পার হওয়া জরুরি। একজন অন্ধ শিল্পীরও চক্ষুষ্মান হওয়ার অধিকার আছে শর্তসাপেক্ষে; বোদলেয়ার যাকে correspondence বলেন, সেই অন্য অনুভূতির জগতে অভিজ্ঞতাকে অনুবাদ করে দিলেই বিনোদবিহারী অন্ধের বাস্তবতা খুঁজে পান। আমি শুধু এইটুকু বলব– প্রথম এই বাস্তবতা বঙ্কিমচন্দ্র খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর কানা ফুলওয়ালি রজনীর মধ্যে; যখন সেই কিশোরী প্রথম পুরুষস্পর্শে কুসুমের ঘ্রাণ খুঁজে পায়। অথবা, আমরা দৃষ্টান্ত হিসাবে জীবনানন্দ দাশের কথাও বলতে পারি, বিশেষত যখন তিনি লেখেন, 'আকাশকুসুম তবু ফুটে আছে পাপড়ি অনুসারে।' এটাই বিনোদবিহারীর কাজ, প্রমাণ করা যে প্রাপ্তবাস্তবতা কোনমতেই শিল্পীর নয়, তাকে বাস্তবতার পুনর্সংগঠনে জোর দিতে হয়। আর সেই অর্থেই শিল্পীর বাস্তবতা কৃত্রিম। সত্যজিৎ রায় নিজেও যখন তাঁর ক্যামেরা দিয়ে নিসর্গ বা মানুষকে দেখেন, তাতে যে আলোর মলাট থাকে, তা তাঁর নিজস্ব। এইটাই অন্তর্দৃষ্টি, বস্তুত ছানি কাটার একটি ব্যর্থ অপারেশনে বিনোদবিহারী অন্ধ হয়ে গেলে, অন্য চলচ্চিত্রকার হয়তো সন্ধ্যার কোন রাগ, হয়তো বিধুর পূরবী জুড়ে দিতেন, কিন্তু সত্যজিৎ, আমাদের সমালোচকেরা খেয়ালও করেন না যে, প্রয়োগ করেছেন সকালের রাগ আশাবরির একটি অলৌকিক মুহূর্ত। বিনোদবিহারী নয়, বিনোদবিহারীকে উপলক্ষ্য করে সত্যজিৎ রায় নিজেকেই বোঝাতে চাইছেন, শিল্পীর বাস্তব প্রাথমিক গ্রহণযোগ্যতার উপরে নির্ভরশীল নয়। এই জন্যেই কোনারকের মৃদঙ্গবাদিনীর স্তন আজও রক্তমাংসের।

এ পর্যন্ত বোঝা গেল যে, The Inner Eye বাস্তব সম্পর্কিত এক প্রতিবেদন। কিন্তু আমি আরও একটু বলতে চাই, সত্যজিৎ রায়ের বাস্তব সম্পর্কিত ধারণার, বিশেষত দৃশ্যভাষার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যতম উৎস হয়তো বিনোদবিহারীই। এখন আমরা জানতে পারছি, তথাকথিত Oriental art সম্পর্কে সত্যজিতের অবজ্ঞার কথা। তিনি যে ঠাকুরবাড়ির আঙিনা থেকে উঠে আসা ছবি আঁকার ধরন প্রসঙ্গে খুব উৎসাহী ছিলেন, এমন নয়, এইসব তিনরঙা হাফটোন আর্ট প্লেটের মধ্যে এক নন্দলাল বসু ছাড়া আর কারোর ছবি তেমন আমল দেওয়ার যোগ্য মনে হয়নি। ওয়াশ পেন্টিং জিনিসটা জোলো বলে মনে হত। ছবির বিষয়বস্তু ও অঙ্কনরীতিতে একটা পেলব ভাবালুতার ইঙ্গিতে মন বিরোধী হয়ে উঠত। অথচ নিয়তির এমনই কৌতুক যে শান্তিনিকেতন কলাভবনে পৌঁছনোমাত্র সামনের বারান্দায় সারা সিলিং জুড়ে এমন একটি ছবি তিনি দেখলেন, দেখলেন আর মুগ্ধ হলেন, যে সারাজীবন আর সেই মুগ্ধতা তাঁকে ছেড়ে গেল না। গাছপালা, বাংলা পল্লীপ্রকৃতির একটি সাধারণ ছবি। বীরভূমের গ্রাম, কিন্তু কোথাও সম্ভবত একটি গতিময় কথকতা ছিল। আবার সত্যজিৎ রায়কেই উদ্ধৃত করি– 'দৃশ্য না বলে ট্যাপেস্ট্রি বলাই ভালো। অথবা এনসাইক্লোপিডিয়া। এ ছবি এমনই ছবি যার সম্বন্ধে Oriental art সম্পর্কে আমার মনগড়া কোনো সংজ্ঞাই প্রয়োগ করা চলে না।'

আমরা যারা চলচ্চিত্রবিদ্যার ছাত্র, তারা বুঝতে পারছি, সত্যজিৎ রায় স্থির চিত্রের মধ্যে মন্তাজের মহিমা খেয়াল করছেন। The Inner Eye ছবিতে বিশ্বভারতীর হিন্দিভবনের দেওয়ালে বিনোদবিহারীর অসামান্য মুরাল, যাতে মধ্যযুগের সাধুসন্তদের জীবন বর্ণনা করা হয়েছে, তাকে অনুপুঙ্খে পরীক্ষা করেছেন সত্যজিৎ। হয়তো এই মুরাল তাঁর কাছে অনেকটাই দাভিদ সিকুয়েরশ অথবা দিয়েগো রিভেরার মহৎ মুরালগুলির সমতুল্য, কিন্তু আরও উল্লেখযোগ্য যে, চলচ্চিত্র যেমন একটি মুহূর্তে নানা সময়ের বিবরণ দিতে পারে, সত্যজিৎ অনুমান করেন, বিনোদবিহারী ভিন্ন মাধ্যমে তা পারেন, আর তাই হয়তো পরিণত প্রতিভাবান ছাত্র মাস্টারমশাইকে প্রণাম করার সুযোগ পেয়ে যান সত্তর দশকের শুরুতে।

কী অসামান্য লাগে, যখন তাঁর প্রিয়, অতি প্রিয় দশাশ্বমেধ ঘাটের কথা টেনে আনেন। তিনি নিজে *অপরাজিত* ও *জয় বাবা ফেলুনাথ*-এ, আর ভারতীয় সিনেমা তো অজস্রবার এই ঘাটটিকে নজরে এনেছে। কিন্তু বিনোদবিহারী শুধুমাত্র রেখার সংহতিতে বুনে ফেলেছিলেন দশাশ্বমেধের বাস্তবতা। এই অনুষঙ্গ শুধু স্থিরচিত্র, গতিচিত্রের তুলনার মুহূর্ত নয়। সত্যজিতের আত্মপক্ষের বিবৃতি যে, বাস্তবতার বর্ণনাও এক ঘন সংহতির দাবি করে।

বিনোদবিহারী আরও নানা দিক থেকে তাঁকে বাস্তবতার ভারতীয়ত্ব ও বৈশিষ্ট্য বিষয়ে ধারণা দেন। সত্যজিৎ যে আদি যৌবনে মনে করতেন, Oriental art কোন না কোনভাবে শিল্পের মানচিত্রটাকে ছোট করে দেয়,

বিনোদবিহারী তাঁকে এই ধারণার বাইরে প্রায় হাতে ধরে নিয়ে আসেন। শান্তিনিকেতনে স্বল্পকালীন ছাত্রজীবনে তিনি যে অজন্তা-ইলোরা যাওয়ার সুযোগ পান, তা তাঁকে প্রথম ভারতীয় প্রতিমা সম্পর্কে, বাস্তবের সুস্পষ্ট চিহ্নায়ন সম্পর্কে নির্দেশ দেয়। অজন্তা এবং ইলোরার গুহাচিত্রে তিনি বুঝতে পারেন, ইউরোপের দেখা, অন্তত ফ্রেসকোর পরিপ্রেক্ষিতে মূলত জানলা দিয়ে দেখা যা পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সঙ্গে ছোট বা বড় হয়ে যায়। অন্যদিকে ভারতীয় দেখা অনেক সংরক্ত; সেই চিত্র দর্শকের সঙ্গে কথা বলতে সতত অপেক্ষায় থাকে। মিশরীয় শিল্প হয়তো একটু অন্যরকম, কিন্তু সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয়। ভারতীয় ছবি– সত্যজিতের মনে হয়েছিল– অনেক মানবিক। পরিণত বয়সে যখন তিনি বিনোদবিহারীকে খুঁটিয়ে দেখলেন দেওয়ালে, তখন তিনি ঐতিহাসিকের সঙ্গে শিল্পীর পার্থক্যও বুঝতে পারলেন। আদি যৌবনে হয়তো ইলোরায় তিনি লক্ষ্য করেছিলেন কীভাবে বৌদ্ধ চিত্রকলা, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ও জৈন ভাবধারা সহাবস্থান করে, কিন্তু বিনোদবিহারীর কাজে সবিস্ময়ে সেই ঐতিহ্যের একটি প্রামাণ্যরূপ পেলেন; স্বয়ং বিনোদবিহারীই তাকে জানালেন– সময়ের এই নানা অধ্যায় ইতিহাসকারের কাছে যতটা জরুরি, শিল্পীর পক্ষে ততটা নয়। শিল্পী বরং সময়ের ডালপালায় লুকোচুরি খেলতে পারেন। সত্যজিৎ হয়তো এই বক্তব্য থেকেও ইশারা পান যে একজন চলচ্চিত্রকার কীভাবে বাস্তবের টুকরো সময় জুড়ে জুড়ে এক অবাস্তব সময় তৈরি করেন।

নানা সময়েই The Inner Eye দেখতে দেখতে আমার মনে হয়েছে যে, বিনোদবিহারীকে উপলক্ষ্য করে সত্যজিৎ আসলে মন্তব্য করে চলেছেন দৃশ্যশিল্প ও আধুনিকতার করমর্দন বিষয়ে। এই যে তিনি পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি একটি তুচ্ছ গ্রামের তুচ্ছতর জীবনযাত্রাকে শিল্পের বিষয় করে তুললেন ভারতীয় চলচ্চিত্রে তা অভিনব। ভারতীয় চলচ্চিত্র সামাজিক জীবন বলতে দূর ও কাছের নানা তীর্থ সমাজের সদরে ও অন্দরে দেখতে পেত, কিন্তু একটি শিশিরবিন্দু দেখার জন্য তাঁকে *পথের পাঁচালী*র শরণাপন্ন হতে হল। এরই সঙ্গে প্রতিতুলনা করতে পারি বিনোদবিহারীর। বিনোদবিহারী কিন্তু শান্তিনিকেতনের আশেপাশের পল্লীপ্রকৃতিকেই তাঁর নিসর্গচিত্রের উপজীব্য ভেবেছিলেন। বৃষ্টির কল্পনার জন্য তাকে মেঘদূতের কাছে অথবা সুদূর রাজপুতানা কিংবা মুঘল যুগের কাছে হাত পাততে হয়নি। একটি সাঁওতাল পল্লীকেই তিনি পৌঁছে দিতে পারতেন উপন্যাসের তালিকায়। বিনোদবিহারী জাপানে গেছেন, নেপালে গেছেন এবং সে-সব ভ্রমণ তাঁকে সমৃদ্ধই করেছে, কেন-না রেখা আর রং বিষয়ে তাঁর অধমর্ণ হতে কোন আপত্তি ছিল না। আমি বলতে চাই Oriental art বিষয়ে সত্যজিতের বিরক্তির কারণ যে সেই রীতি একটি নির্দিষ্ট প্রকরণের মধ্যে ভারতীয়ত্ব আবিষ্কার করে। অপরদিকে বিনোদবিহারী অবনীন্দ্রনাথের আওতায় থাকা সত্ত্বেও স্বদেশকে সীমামুক্ত করতে পেরেছিলেন। তাঁর মুরালে যেমন ক্লাসিক ঘরানার সঙ্গে মিলেমিশে আছে যুগপরম্পরা, ছবি আঁকার সময় বিনোদবিহারীর কাছে উদাত্ত বা সুগভীর বিষয়ের কোন মূল্যই ছিল না। তিনি জানতেন, খোয়াইয়ের নিঃসঙ্গ তালগাছটিও তাঁর আত্মজীবনী হয়ে উঠতে পারে। সত্যজিতের ছবিতে এই খোয়াই আর তাঁর Solitary তালগাছ আছেও, বিনোদবিহারীর অনুরোধক্রমেই আছে। এমনকি মুরাল তৈরি করার সময়ও দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধী বিনোদবিহারী নিতান্ত অনুমানের ভিত্তিতে সমগ্র রচনার টেনশন তৈরি করেন জীবনের রোজনামচা দিয়ে– 'হ্যাঁ। সবই আমার দেখা জিনিস, জানা জিনিস। দেখলে তো– চানাচুরওলা, কাঁধে বাঁক নিয়ে যাচ্ছে লোক, মেয়ের মাথার ঝুড়ি, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী– সব নিজের চেখে দেখা সাধারণ ব্যাপার। ওসব অ্যাবস্ট্রাকশন-এর যান্ত্রিক ব্যাপারে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই। বাড়ির বাইরে থাকবে মিউরাল, সামনে দিয়ে লোক চলাচল করবে, দেখে অন্তত বুঝতে পারবে এগুলো মানুষ।' সত্যজিত রায়ও কিন্তু তাই। *পথের পাঁচালী* থেকে বাস্তবের যে প্রতিরূপায়ণ শুরু হল, এমনকি *চারুলতা*তেও, তো আমাদের রোজ-চেনা বাস্তব, তাকে আমরা শনাক্ত করতে পারি, তাতে দূরের পাহাড়ের সম্ভ্রম অথবা সমুদ্রতলের হাতছানি নেই; তা আমাদের এতই চেনা যে সত্যজিৎ না দেখালে হয়তো চিনতেই পারতাম না। বাস্তব গঠনের এই অনুপ্রেরণার উৎস হয়তো বিনোদবিহারী-ই। আর তিনি যে ইতালীয় নববাস্তবতার সৌজন্যে রোজনামচাকে ইতিহাসের পর্যায়ে উন্নীত করতে চান, একটি পরিবারের জীবনবৃত্তান্ত হয়ে দাঁড়ায় ঔপনিবেশিকতার আড়ালমুক্ত নাগরিকতার স্বাধীনতা প্রাপ্তির ইতিহাস– আদানপ্রদানের এই তত্ত্বটুকুও হয়তো উসকে দিয়েছিল বিনোদবিহারীর ক্লাস করার অভিজ্ঞতাই।

বিনোদবিহারী যে তথাকথিত প্রাচ্যরীতি পরিহার করেন, তিনি যেভাবে জানান, মিশরীয় কী পশ্চিমী চিত্রকলার সঙ্গে ভারতীয় রীতির আপাত কোন ঝগড়া আছে মনেই করেন না বরং চান একটি সমন্বিত মনোভাব গড়ে তুলতে, সত্যজিৎ রায়ও তেমনই পৌরাণিকতা অথবা দেশপ্রেমের আবহ থেকে ভারতীয় ছবিকে মুক্তি দেন, তাঁর deep focus যদি-বা ওরসন ওয়েলস্-এর কাছে হাত পাতে, *পথের পাঁচালী*র বালকটি যদি-বা *বাইসাইকেল থিভ্‌স*-এর শিশুটির ছায়া থেকে উৎপন্ন হয়, তা জানান দিলে সত্যজিৎ রায় কোনদিনই লজ্জিত হবেন না, উপরন্তু নিখিলের আনন্দের স্বাদ যে তাঁর বাস্তবের উপকরণ, এই জানাতে পেরে তার গৌরবের অন্ত থাকে না। আর আজীবন যে detail প্রীতির জন্য সত্যজিৎ রায় বিখ্যাত, তার সঙ্গেও তো বিনোদবিহারীর কোথাও একটা সাদৃশ্য আছে। সত্যজিতের বলা বিনোদবিহারীর একটা গল্প বলি– একবার তাঁর মাস্টারমশাই বাইরে বসে একপাল মোষের ছবি আঁকছেন, তো কয়েকটি সাঁওতাল মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখছে। হঠাৎ তারা মন্তব্য করে– এতগুলো মোষ আর একটাও বাচ্চা নেই। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত বিনোদবিহারীর সামনে জীবনরহস্যের পাতা খুলে যায়। সত্যজিৎ নিজেও যখন দৃশ্য রচনা করেন, তখন মনুষ্যেতর প্রাণী– বিড়ালশিশু, কুকুরের লেজ বা জলপিপি তাঁর নজর এড়ায় না, কারণ বিনোদবিহারীর ছাত্র হিসেবে তিনি জানেন যে, সব বাস্তবেরই কিছু অল্প দামি গয়নাগাটি থাকে। তাছাড়া, ক্যামেরায় দেখাও তো খানিকটা বিনোদবিহারীর দেখার সঙ্গে মেলে– দৃষ্টিস্বল্পতার জন্য বিনোদবিহারী দূরের দৃশ্য যা সিনেমার ভাষায় লং শট– আঁকার ঝুঁকি তেমন নিতেন না। আউটলাইনেই কাজ সারতেন। তাঁর অনুধ্যানের বিষয় ছিল ক্লোজআপ। চোখের খুব সামনে থেকে দেখা প্রকৃতি বা মানুষ– একজন চলচ্চিত্রকার হিসেবে সত্যজিৎ নিজে কি অভিজ্ঞতাটি মিলিয়ে নেবেন না? অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বিনোদবিহারী যেভাবে রেখার বদলে বস্তুর ঘনত্বে আস্থা রাখতে শুরু করেন, আমার মনে হয়, *চারুলতা*র বিখ্যাত প্রথম সিকোয়েন্সে চারু সেভাবেই ধনী গৃহে আসবাবপত্রের নিরন্ধ্র ঘনত্ব খুঁজে পায়। এই ছবির শেষে সত্যজিৎ বিনোদবিহারীকে উদ্ধৃত করেছেন যে অন্ধতা হল এক নতুন অনুভূতি, এক নতুন অভিজ্ঞতা, অস্তিত্বের এক নতুন স্তর। পিকাসো ভিন্নতর পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন, ছবি আঁকা হল অন্ধদের শিল্প। সত্যজিৎ রায় হয়তো জানতেনই না, মাস্টারমশায়ের জীবনচিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি আত্মজীবনীর সংযোজনই তৈরি করেছেন। ক্যামেরাতে লুক থ্রু করলে বাস্তবের বাইরের দিকটা দেখা যায়, ভেতরের দিকটি থাকে প্রতিভার রান্নাঘরে। এই সত্য বুঝতেন, বলেই তো তিনি সত্যজিৎ রায়।

পূজা ফুল না ফুটিল দুঃখনিশা না ছুটিল না টুটিল আবরণ

বোর্হেসের একটি গল্প আছে যে একজন শিল্পী নানা ধরনের ছবি আঁকছেন: প্রাসাদ, ভূদৃশ্য, নারী, প্রান্তর, সমুদ্র, গ্রাম ও নগর; আর জীবনের শেষে তিনি উপলব্ধি করলেন যে সমস্ত ছবি শেষ পর্যন্ত আত্মপ্রতিকৃতি। *রামকিঙ্কর* তথ্যচিত্রটি আসলে ঋত্বিক ঘটকের জীবন ও কর্ম বিষয়ে ঋত্বিক ঘটককৃত মন্তব্য। এমন এক শিল্পী, অগ্রজপ্রতিম যাঁর মধ্যে ঋত্বিক ঘটক খুঁজে পান সৌন্দর্যের সারাৎসার। এমন এক শিল্পী, যিনি শান্তিনিকেতনে সমবেত আশ্রমিকদের মধ্যে চূড়ান্ত ব্রতহীন আর তাই তাঁকেই ঋত্বিক বন্দনা করলেন আলোকের এই ঝর্নাধারায়, যার নাম চলচ্চিত্র।

১৯৭৫ সাল, ডিসেম্বর মাসের প্রথম রবিবার। ঋত্বিক জনৈক আগ্রহী ক্রেতাকে সেদিন *রামকিঙ্কর* তথ্যচিত্রের 'রাশ' দেখাবেন– তখনও শব্দ সংযোজিত হয়নি। সস্ত্রীক ঋত্বিককুমার ঘটক প্রথম সারিতে ভদ্রলোকের সঙ্গে। আমি, কবি অনন্য রায়, মহেন্দ্রকুমারসহ পিছনের সারিতে। গ্যেটে একবার বলেছিলেন– পৃথিবীর সব কবিই নিজেদের সঙ্গে কথা বলেন, আমরা আড়ি পেতে শুনে ফেলি। আমি সেদিন দেখেছিলাম রামকিঙ্কর বেইজ ও ঋত্বিক ঘটক কী নিঃশব্দে পরীক্ষা করে চলেছেন দৃশ্যকলার রূপকথা। হঠাৎ আমার চোখে পড়ে সেই অলৌকিক মুহূর্ত; ঋত্বিক ঘটককে ঈষৎ উত্তেজিত দেখাল– তিনি সোজা হয়ে বসলেন, তাঁর তর্জনী পর্দার দিকে নির্দিষ্ট। আলোর অবিশ্বাস্য বিন্যাস এসে রামকিঙ্করের ক্লোজআপ গঠন করেছে। রক্তমাংসের রামকিঙ্কর যেন ক্রমে প্রস্তরীভূত হয়ে গেলেন।

একেই তো রঁদ্যা বলেছিলেন, শ্রাব্য আয়তন বা audible space; আর রবীন্দ্রনাথ, বেঠোফেনের প্রসঙ্গে, শব্দহীন শব্দের জগৎ, প্রকৃত প্রস্তাবে ঋত্বিক রামকিঙ্করের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন আগুনের বীজসমূহ– ধ্বংসের উৎসব, যা নিজেকে প্রথা থেকে সরিয়ে নেয় অনিয়মে, প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র থেকে কেবলই দূরে নিয়ে যায় পরিধির প্রান্তিকতায়। সকল নিয়ে যিনি বসে আছেন সর্বনাশের আশায়, শান্তিনিকেতন যাঁকে নিরাপত্তা দিতে পারে না, ওই তপোবনে যিনি পবিত্র অসঙ্গতি, তাঁকেই ঋত্বিক অর্ঘ্য নিবেদন করেন, ওই হন্তারক ক্লোজ আপ-এ।

ফরাসি মনীষী আঁদ্রে মালরো তাৎপর্যপূর্ণ জানিয়েছিলেন, দস্তয়ভস্কির কারামজভ পরিবারের প্রকৃত বাসস্থান হতে পারে 'কিন্তা দেল সরদো' অর্থাৎ বধির মানুষের কুটির; আমাদের হাতের সামনে আছে বধির বেঠোফেনের নবম সিম্ফনি। আধুনিকতার স্রোত-প্রতিস্রোতে এইসব চিহ্নমালা উৎকীর্ণ থাকে। ঋত্বিক তাকেই দেখেছিলেন শান্তিনিকেতনের বাইরে রামকিঙ্করের ওই টালির ঘরে। ঋত্বিক ঘটক জানতেন, জানতেন বলেই ঋত্বিকের ক্যামেরা ক্রমাগত জোর দিতে থাকে রামকিঙ্করের আধিভৌতিক প্রাণীচিত্রে আর ঋত্বিক বিশ্বাসও করেন যে, নিম্নবর্গীয় রামকিঙ্কর সভ্যতার অধিক বয়সি ও আদিম বলেই সভ্যতার অসম্পূর্ণতা বিষয়ে রায় দিতে পারেন। আশিরপদনখে সভ্যতার বিচারক হওয়াই তাঁর নিয়তি। এই জন্যেই ষাট দশকের শুরুতে সাঁওতাল রমণীদের পায়ের তালে তালে এগিয়ে আসার অনুষঙ্গে *সুবর্ণরেখায়* রামকিঙ্করের 'চাল কলের ডাক' নামের শিল্পকর্মটিকে চকিত বিদ্যুল্লতার মত উপহার দেন তিনি। রামকিঙ্কর যে অন্তরতমকে একা দেখার জন্য মদ ও নারীকে বেছে নিয়েছিলেন, তা ঋত্বিকের নজর এড়ায়নি। আমাদের চোখের সামনেই তো কলকাতায় সমস্ত পানশালাগুলি এই চলচ্চিত্রকারেরও বিদায়গাথা রচনা করে দিচ্ছিল। সকল লোকের মাঝে বসে একান্ত যে দুঃসাহস, রাবীন্দ্রিক পরিশীলনের হাস্যকর পরিমণ্ডল থেকে সুদূর হয়ে যাওয়ার যে কারুবাসনা রামকিঙ্করকে আলাদা করে দিয়েছিল, তা ঋত্বিকের ঈর্ষা ও অনুধ্যানের বিষয় ছিল। রামকিঙ্করকে হঠাৎ তিনি তথ্যচিত্রের প্রয়োজনে পাঠ্য ভাবেননি। রামকিঙ্করের রেখায় যে উন্মাদ, বক্রিমার সীমাছাড়ানোর ডাক, যা বোলপুরের নিজস্ব নিসর্গচিত্র, তাঁকে ঋত্বিক প্রাণাধিক আদরে চিনতে পেরেছিলেন। *অযান্ত্রিক* ছবিতে, *মেঘে ঢাকা তারায়* যে প্রকৃতি, তা মানুষ নিরপেক্ষভাবেই সংযুক্ত। আইজেনস্টাইনের ভাষায়, Non indifferent nature। রামকিঙ্করের পথে ঋত্বিক সেই প্রবণতাকেই পুনরাবিষ্কার করেন। ছবিতে আমরা স্থির নিথর বুদ্ধদেবকে দেখতে পাই। কিন্তু এই বুদ্ধ তো শিল্পীর আরাধ্য; সঙ্কল্পবদ্ধ; গায়ে শ্রমবিন্দু, কোন ইশারা সেই বুদ্ধকে বিচলিত করতে পারে না। তা রামকিঙ্কর ও ঋত্বিককেও টলাতে পারেনি।

যে নারী-পুরুষ ও শিশুটিকে আমরা দেখি ভাস্কর্যায়িত, তাতে গতির তরঙ্গ, আলোর অপেরা; কিন্তু আমরা খেয়াল করিনি ঋত্বিকের ক্যামেরা অনুপুঙ্খ এই উৎফুল্ল দম্পতিকে না চেনালে হয়তো অজানাই থাকত– পাথরের এই সংগীত যে সকালে সদ্যস্নাতা এই রমণীর কাপড় শুকিয়ে নেওয়ার আধুলা, বাস্তব থেকে মুহূর্তে বাস্তবাতিরিক্ত অথবা পুরাণে পৌঁছে যাওয়া আর সেখান থেকে আবার মাটির পৃথিবীতে নেমে আসা– এ তো ঋত্বিকের প্রথম প্রণয়পত্র, আর রামকিঙ্কর কী অবলীলায়, কী অবহেলায়, দিনের পর দিন সানন্দে, তালে বর্ণনা করে গেছেন চিত্রে ও ভাস্কর্যে।

সুইস পার্কে সেদিন ছবির শেষে ঋত্বিক পিছন ফিরে তাঁর ভক্তদ্বয়কে তাচ্ছিল্যভরে জানিয়েছিলেন, কিঙ্করদার কাছে তো একটাই জিজ্ঞাসা, art কোথা থেকে হয়। রামকিঙ্কর কী জবাব দিয়েছিলেন, আমাদের জানা নেই, কিছু আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই, তাঁর চোখ আর্যস্থাপত্যকে ছাড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে প্রাচীন আশিরীয়, দ্রাবিড় বা মিশরীয় অভিজ্ঞানে। রামকিঙ্কর, রামকিঙ্করের রবীন্দ্রনাথকে ঋত্বিক যেভাবে ক্যামেরায় ধরেন তাতে দেখা যায়, বাস্তব ক্রমশ ত্বকের বদলে আত্মায় হাত রাখতে চায়। এত বিষণ্ন, গম্ভীর ও নির্জন, এত পরিত্যক্ত কবিকে কখনো আমরা দেখেছি কি? রামকিঙ্কর মৃত্তিকার সন্তান, তাঁর স্তনদায়িনীকে তিনি শনাক্ত করেন। কিন্তু একইসঙ্গে সভ্যতার অধিক বয়সি তাঁর কেশরাশিতে, তার মুখের রেখায় প্রাক্‌পৌরাণিক স্মৃতি। ঋত্বিকের ক্যামেরা কী উৎফুল্ল হয়ে নারী শরীরের উদ্বেলতাকে চিনে ফেলে, আর গান্ধীকে ইতিহাসপুরুষ হিসেবে বর্ণনা করেন, সমধর্মী এক অগ্রজের কাজে তিনি প্রার্থনা করেন জীবনের লুপ্ত সংকেতসমূহ, কিংবদন্তী। চিড়িয়াখানার বাসের মধ্যেই রিলকে যেমন অনুভব করেছিলেন শক্তির নর্তন এক, স্থির কেন্দ্রে অপ্রতিহত, ঋত্বিক তেমনভাবেই আকুল হয়ে দেখেন রামকিঙ্করের পাথর। ঋত্বিকের ফ্রেম ও রামকিঙ্করের পট– উভয়েই সীমাবদ্ধতাকে যুগপৎ ঠাট্টা ও স্বীকার করে যায়।

ঋত্বিকের *সুবর্ণরেখায়* যে রামায়ণকথা, তা সমাজের তলানি থেকে উঠে আসা। তাঁর রামচন্দ্র ঘাটশিলার অদূরে ছাতিমফুল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যে মাতৃবন্দনা করে, যে কৌশল্যাকে আবিষ্কার করে, সে কোন উচ্চবর্ণসম্ভূতা রাজমাতা নয়। সামান্য বাগদি বউ। রামকিঙ্করের যক্ষিণীও– তার শ্রোণিযুগ ও নিম্নোদর দেখলেই বোঝা যায়, নন্দনতত্ত্বের অভিজ্ঞান নয়, কোন প্রান্তিক রমণীর গোপন প্রদেশ। দু'জনেই অনার্য, দু'জনেই ব্রাত্য, ঋত্বিক ও রামকিঙ্কর আসলে ক্রমাগত নিজেদের আত্মার সম্প্রসারণ ঘটান ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে।

আরও কয়েকবছর বাদে তাঁর স্বপ্নপর্যায়ের একটি ছবিতে টুপি পরিহিত উন্মাদ ভ্যান গঘের কাকেরা ফ্রেমের বাঁধন ছাড়িয়ে উড়ে গিয়েছিল– কুরোসাওয়া চাইছিলেন ছবির স্থিরতা মুক্তি পাক সংগীতের চলমানতায়। ঋত্বিক মূলত চলমান চিত্রমালায় নিবেদিত বলেই তিনি রামকিঙ্করের মধ্যে প্রতিমুহূর্তেই চিহ্নিত করেন সম্ভাব্যতার উৎস। যা কিছু অ-সম্ভব, যা কিছু অ-বাস্তব, রামকিঙ্করের সৌজন্যে রেখা আর রঙে পর্বত যে কী করে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ হতে পারে, তা এই চলচ্চিত্রকার জানাবার সুযোগ পান। তাঁর কাছে রামকিঙ্কর বিপরীতের মিলন, মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিকতার একটি মূর্ত দৃষ্টান্তও।

সমস্যা এই যে, ঋত্বিক ছবিটিকে সম্পাদনা করতে পারেননি। এমনকি শব্দসংযোজনের সুযোগও পাননি। আর আজ, মৃত্যুর পরে এই ছবির সম্পাদনার দায়িত্ব নেওয়া তো প্রায় পাপ! আইজেনস্টাইনের *কে ভিভা মেজিকো* নামক অসমাপ্ত ছবিটিকে নিয়ে এরকম একটি চেষ্টা হয়, আর সঠিক কারণেই সবান্ধব জঁ ল্যুক গোদার সে প্রচেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ করেন। বস্তুত আজ, রামকিঙ্কর সম্পাদিত হলেও স্রষ্টার মূল পরিকল্পনা কী ছিল, তিনি কিভাবে প্রাক্ ও উত্তর ইতিহাসকে চিত্রায়িত দেখছিলেন, আমাদের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি, আন্তনিওনির *Beyond the cloud* ছবিটি স্রষ্টার স্নায়ুবিপর্যয়ের কারণ, সম্পাদনা করেন ভেন্ডার্স। সবচেয়ে করুণ পরিণতি হচ্ছে এই ভেন্ডার্সের যাবতীয় আন্তরিকতা সত্ত্বেও ছবিটি দেখলে প্রায় বোঝাই যায় না যে তা আন্তনিওনি স্বাক্ষরিত। সংক্ষেপে বলার, পৃথিবীর স্রষ্টারা, ঋত্বিক ও আন্তনিওনি নির্বিকল্প। তাঁদের প্রদেশে হস্তক্ষেপ করা অনৈতিক।

ঋত্বিক ঘটক হয়তো রামকিঙ্করকে পরতে পরতে দেখতেও চাননি। যেমন সত্যজিৎ চেয়েছিলেন বিনোদবিহারীকে। নিজে মূলত বক্তব্যধর্মী বলেই তাঁর উদ্দেশ্য রামকিঙ্কর নামক সন্দর্ভকে নিবেদন করা। তিনি যতটা তথ্যচিত্রের আড়ালে ইতিহাসকার ও দার্শনিক, ততটা মানতেই হবে আখ্যানপ্রণেতা নন।

সত্যজিৎ বিনোদবিহারীকে দেখেছেন, ঋত্বিক রামকিঙ্করকে। কিন্তু একজন শিল্পী কি কাউকে দেখতে পান? তিনি তো পিকাসোর ছবির মতই আয়নার সামনে নারী। হয়তো দু'জনেই দেখতে চেয়েছিলেন, অপর দুই শিল্পীকে, আর শেষপর্যন্ত দু'জনেই জীবনীর বদলে যা উপহার দিয়ে গেছেন, তা আত্মজীবনী। যদি সত্যজিতের পছন্দের তালিকা দেখি, তাহলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তিনি শিল্পীর সংসারেও এক ধরনের গৃহিণীপনা দেখতে পান। তা ধ্রুপদী হলিউড ছবিই হোক বা নববাস্তববাদী ডি-সিকার ছবিই হোক, কিংবা ত্রুফোর *ফোর হান্ড্রেড ব্লোজ* বা আন্তনিওনির *লাভেনচুরাই* হোক। আর ঋত্বিক নাশকতার উৎক্ষেপ দেখতে পান তাঁর আরাধ্যদের তালিকায়– তত্ত্বের মধ্যে মন্তাজ নিয়ে আইজেনস্টাইন ও পুডভকিনের 'ঝগড়া' তাঁকে ভাবায়। বুনুয়েল তাঁর প্রিয় পাত্র। ফেলিনির অন্তর্ঘাত, অন্তত *লা দলচে ভিতা* তার পাঠসংকেত। ফলে, তথ্যচিত্রের আপাতদূরত্ব যে সত্যজিৎ ঋত্বিকের ক্ষেত্রে মনোপ্রবণতারও দূরত্ব রচনা করবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আসলে শিল্পী হতে গেলে তাঁকে বাঁহাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ তো রেখে যেতেই হবে।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
ভারতের প্রাবন্ধিক, চলচ্চিত্রবোদ্ধা

মুখোশে উদাস বোধ

শাহীন রেজা

কেমন বিবশ রোদ বোশেখের কাল
তামাদি ছায়ার নীচে কৃষকের হাল

জলের অভাবে মাঠ ক্রমাগত ফাটা
চিলের জঠর জুড়ে নিরাশার কাঁটা

শেষের কবিতা আঁকা দিগন্তের পাড়
কসাই বালক– চোখে কিরিচের ধার

অরণ্য অনলে কাঁপে দুধরাজ সাপ
চিরল উদাসে হাসে মৃগয়ার পাপ

ছিল না কিছুই পাশে বোশেখীর ক্ষণ
অধর জানালা খুলে নামে বুঝি রণ

বাঁশিতে বিরান ধ্বনি দুইকুল ভাঙে
অসীম জোয়ার জাগে উজানের গাঙে

এসেছে সুরের মায়া করতাল ঢোল
মুখোশে উদাস বোধ আবীরের বোল।

নিরাশ্রয়ের আকাশ বন্দনা

লিলি হালদার

এভাবেই ভুলে যেতে হয়–
দাবানলে দগ্ধ পাতার পূর্ণ বিবরণ।

এখন হাওয়ায় ওড়ে আগুন গন্ধ ছাই–
বাতাস ভারী করা শ্বাসরুদ্ধ গ্যাস–
দূরে বসে বাজপাখি পতঙ্গের চোখে,
ছোঁ মেরে তুলে নেয় উদ্বাস্তু মন।

প্রাণ নিয়ে ছুটে যাওয়া শিকারীর শিকার
সমাজে ক্লেদক্লান্ত যাবতীয় জাঁতাকল
নতুন ফসলের আগে এলোমেলো মাটি
দাহ বুকে খোঁজ, বৃষ্টি জীবন।

মেঘ আছে, বৃষ্টি আছে উষ্ণ মরুভূমি
নক্ষত্র-খসা রাত, নিরাশ্রয়ের আকাশ বন্দনা
দিনলিপি... লেখা হয় আগামী পদের,
ফিরে আসে আবার চোখে শৈল্পিক মনন।

লিলি হালদার ভারতের কবি

জন্মদিন

আইউব সৈয়দ

জীবন ও শিল্পের পথপরিক্রমার সবটুকু ভাল-লাগা
জমা হয়েছে জ্যোৎস্না-ধোয়া ঝুড়িতে, নরম রোদের মতন
পৌষের উচ্চারণ পুরোপুরি স্পন্দিত হয়ে
মিশে গেছে ভোরের আলাপনে
অনাবিল আচরণের ঘ্রাণ আর তন্ময়তার আলাদা সৌন্দর্য
দুটোই আনন্দ সন্ধানী দেহমনে ঠুকে
এই দৃশ্য সত্তার দৃশ্যাবলি– এই দৃশ্য বিমূর্তের মঞ্চায়ন

এমন মঞ্চায়ন তবু সব মিলিয়ে সগৌরবে সম্মিলিত আবেগ
প্রাত্যহিক স্পর্শ করে
তেতাল্লিশ জানে এখানেই সঞ্চয়ের সাহস– আকাঙ্ক্ষার ধ্বনিও এখানেই
পাশাপাশি অভিজ্ঞতা নতুন সৃষ্টিতে জিকির তোলে
উৎসারণের উপস্থিতি ঘনিষ্ঠ নাড়ির বন্ধন যেন
এই পরিচয় অনুভবের পরিশীলিত বিস্ময়
এই সত্য মিলিয়ে যায় না ভিড়ে, এই দৃশ্য তেতাল্লিশতম জন্মদিনের

এই যে তেতাল্লিশ সাধারণ মানুষের, সাধারণ জীবনের তেতাল্লিশ নয়।
শাহানার তেতাল্লিশ জীবনকে দেখার লেখার তেতাল্লিশ
সৃজনের ভেতরই বাস করা বাহারী সুরে
দোল খাওয়া রঙের বিবরণ– রাগ অনুরাগের
ভরাই কোন কুয়াশার অঙ্গীকার; শীতার্ত প্রহরে
ফুল তোলা জয়ের স্বেচ্ছায় বিলিয়ে দেওয়া উল্লাস

স্মৃতি বিস্মৃতির প্রান্তর পেরিয়ে এভাবেই
আশ্রয় খোঁজে দ্যুতির সুন্দরতার জন্মদিন।

মাধবের কম্পিত হাত

হাসান মোস্তফা

বিষণ্ন জ্যোৎস্নায় রোগক্লিষ্ট মাধবকে হেঁটে যেতে
দেখেছিলাম একদিন স্মৃতির শহরে
মাধব একটু দাঁড়াও কেমন আছ?
ঘুরে দাঁড়াতেই আলো আঁধারে মাধব হয়ে উঠল
দুঃখ-কষ্টের আবক্ষ মূর্তি
মাধবের মৃদু হাসি কান্নারও অধিক কান্না হয়ে ওঠে
মিলপাড়ায় সেই রাতে।
মাধব বলল এখন টিউশনিতেও কেউ ডাকে না
সংসারে নিত্য জ্বলে ওঠে দাউ দাউ অভাবের আগুন।

অভাবে মরছে মাধব কিন্তু মর্যাদাবোধ আঁকড়ে আছে মাধবকে।

পাতবে না হাত মাধব কারো কাছে
কেবল ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ঊর্ধ্বে উঠে আছে
মাধবের কম্পিত হাত।

নাচন

নিজাম উদ্দিন আহমেদ

চোখের তারায় চড়ুই– নাচছে ময়ূর
যেমন নাচে মিথুন বেলায়
কই সে পাখি?
পাখি তো নয়– নাচছে আঁখি।

কেমন করে আঁচল নাচে?
কাঁচুলি নাচে বুকের পরে
অধর দু'টো তেমন নাচে
যেমন নাচে, মুক্তবেণী পিঠের পরে।
কেউ নাচে না আমি নাচি
আমার সাথে ভুবনভরা আদম নাচে
যেমন করে আমায় নাচাও
তেমন তেমন আমি নাচি।

প্রসূন কাঁপে প্রজাপতির বিদ্ধ শরে
যেমন বিঁধ কণ্ঠনালীর চিকন স্বরে,
চামর নাচে মাথার উপর তপ্ত দুপুর শূন্য ছায়ায়
ঝরছে পড়ে অশ্রুফোঁটা শুকনো কাঠের নিথর কায়ায়।
ক্যামনে নাচাও? নাচাও তুমি–
নাচল যেমন পার্বতীর বর
কাঁচা কাঠের স্তূপের ভিতর?

সুখের মতন উবে গেলে

সুধীর কৈবর্ত

(আলতাফ মাহমুদ স্মরণে)

এভাবে হঠাৎ করে চলে যাওয়া– বান্ধবহীন করে–
(আত্মপ্রতারণার অনুশীলন, অনুমোদন আর
বাস্তবায়নই ধ্যান-জ্ঞান-পণ যখন!) এ কি ঠিক
হল, বল?– অনেক অনেক পরীক্ষা দিয়ে (বুঝি-বা
অগ্নিপরীক্ষাও) তবেই বন্ধুত্ব– বন্ধু মেলে (বড়ি
মুশকিলসে মাগার দুনিয়ামে দোস্ত মিলতে হ্যায়);
দুঃসময়ে পাশ কাটায় অনেক কলকণ্ঠই–
বন্ধু থেকে যায় শাশ্বত অম্লান (উমরভর দোস্ত
লেকিন সাথ চলতে হ্যায়)!

ধরিত্রীর ঊষর-ধূসর, চড়াই-উৎরাই বুকে পুরুষ
আর প্রকৃতির চিরায়ত রূপ-কর্ষণ, রোপণ আর
অঙ্কুরোদ্গম; ফসল ফলে, ঝরে পড়ে–
জনম আর মরণের পরম্পরা!

কোনও কোনও হৃদয়ের কোমল উৎসে কষ্ট আর
কান্নাই চিরস্থায়ী করে দিয়ে (কতটাই নিষ্ঠুর তুমি!)
ক্ষণস্থায়ী সুখের মতন উবে... উবে গেলে!

আমি কাঠগোলাপ গাছ

সরওয়ার মুর্শেদ

কোর্ট স্টেশনের পুব-পাশের
তরুণ কাঠগোলাপের শাখায় ঝুলে থাকা
বৌদ্ধপূর্ণিমার নরম লাজুক চাঁদ–
একদিন এমনি সন্ধ্যায়
পঁচিশে বৈশাখের মহড়ায় কোরাস গেয়ে
আমারই সাথে তুমি ঘরে ফিরবে
এমনি কথা ছিল–
দীপা রায়।

আমার ক্ষয়ে যাওয়া স্বপ্নের মধ্যে
এখনো সেই কাঠগোলাপের ঘ্রাণ পাই,
কত বৌদ্ধপূর্ণিমায়
এখনো কোর্ট স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়ে যাবার
হুইসেল শুনি,
কত পঁচিশে বৈশাখ চলে যায়।

আজ ভাবি, তুমি একদিন এ স্টেশন থেকেই
এক ঝোড়ো গায়ত্রী সন্ধ্যায় ট্রেনে
চেপে চলে গিয়েছিলে
অনির্দিষ্ট যাত্রায়;
জানালায় তোমার শ্যামলা মুখ বাড়িয়ে
বৃষ্টিভেজা কাঠগোলাপ গাছটিকে
শেষবার হাত নেড়ে বলেছিলে–
'বিদায়'!

তুমি কখনো জানতে পারনি
ওটা কাঠগোলাপ গাছ ছিল না;
ওটা ছিলাম আমি,
সেদিন সন্ধ্যায়
দীপা রায়, তুমি আমাকেই বলেছিলে–
'বিদায়'।

ছেঁড়ামন

সুমী সিকান্দার

শুধু সুতি শাড়ি নয়– নারীটিও ছেঁড়া–
কত বিচিত্র তালিতে-কালিতে
শত বিনিদ্র জালেতে-জালিতে
ভরা চাঁদ কাটে ফালিতে-ফালিতে
অবিরত রতি গলিতে-গালিতে।

প্রবন্ধ

বাংলা গানে আধুনিকতা ও নজরুলের গান

ড. সন্তোষ ঢালী

'আধুনিকতা'র সংজ্ঞারূপ নির্ণয় দুরূহ ও জটিল। কোন নির্দিষ্ট অভিধায় তাকে শনাক্ত করা সম্ভব নয়। সাম্প্রতিকতম বিষয়-ভাবনার সর্বশেষ পরিশীলিত রূপকেই 'আধুনিক' বলা যেতে পারে। শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আধুনিকতার নির্দিষ্ট কোন কাল পরিসীমা নেই; থাকতে পারে না। যুগের চাহিদা অনুসারে কোন কিছুর ঐ যুগের সবচেয়ে উৎকর্ষময় প্রকাশই হল তখনকার মতে আধুনিক। পরবর্তী সময়ে সেই বিষয় ভাবনা, আঙ্গিক গঠন, প্রকরণের উৎকর্ষ আরও বৃদ্ধি পেলে অর্থাৎ চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণাকে পাল্টে দিয়ে নতুনের সাধ জাগাতে সক্ষম হলে কিংবা যুগোপযোগী হলে আগে যাকে আধুনিক বলা হত, তা আর আধুনিক থাকে না। আবার আজ যা আধুনিক, আগামীকাল তা পুরনো। তাই 'আধুনিক' শব্দটা বড়ই আপেক্ষিক।

আবার শিল্প বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে সব বৈশিষ্ট্যকে আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য বলে ধরা হয়, সংগীতের ক্ষেত্রে ঠিক সেই সেই বৈশিষ্ট্যকে আধুনিকতার মাপকাঠি হিসেবে মনে করা সঙ্গত না-ও হতে পারে। আধুনিক বাংলা গান যে যে বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ অর্থাৎ আধুনিক বলে স্বীকৃত যে সব গান তার পূর্ববর্তী গান থেকে স্বতন্ত্র, সে-সব গান যে যে বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র, তা-ই আধুনিক বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সংগীতে আধুনিকতা দু'রকমভাবে প্রযুক্ত হতে পারে–

ক. কথায় (বিষয়) ও খ. সুরে (গায়ন বৈচিত্র্য)।

বিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা গানে যে সব ধারার প্রচলন ছিল, তাতে ব্যক্তি মানসের প্রকাশ অর্থাৎ মানবিক আবেদন অনুপস্থিত ছিল। ভজন, কীর্তন, পদাবলি, রামপ্রসাদী, শ্যামাসংগীত, বাউল বা লোকগীতি, দেহতত্ত্ব ইত্যাদি প্রচলিত গানগুলোতে নর-নারীর একান্ত ব্যক্তিগত আবেগ-উচ্ছ্বাস, আনন্দ-বেদনা, বিরহ-মিলন, সুখ-দুঃখের কথা অনুপস্থিত ছিল। গায়ন পদ্ধতিতেও ছিল কিছুটা গতানুগতিকতা

অর্থাৎ সুরের বৈচিত্র্য কম ছিল। রাগ-রাগিণীর ব্যবহার বা মিশ্রণ ছিল সীমিত। বাংলা গানে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটল সেই সময় থেকে, যখন থেকে বাংলা গান এই পূর্ববর্তী ধারার খোলস ভেঙে বেরিয়ে এসে মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত মানবীয় অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটাতে শুরু করল। নর-নারীর অর্থাৎ মানুষের ভালবাসার কথা প্রকাশ করতে শুরু করল।

বাংলা গানে ভালবাসার কথা উপস্থাপনার ধারা প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন বিশিষ্ট টপ্পাকার নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত: ১৭৪১-১৮৩৯)। রাধাকৃষ্ণের বাল্যলীলা, প্রেমলীলা, রাসলীলা ইত্যাদি থেকে মুক্ত করে সাধারণ মানুষের ভালবাসার প্রেরণাকে বাংলা গানের উপাদানের উপাত্ত করে তিনি সর্বজনীনতা আনেন। তাই নিধুবাবু ছিলেন বাংলা গানে মানুষের পার্থিব প্রেম ও হৃদয়াবেগের মুক্তিদাতা।

বাংলা গানকে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান পাঁচজন হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০), অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪) ও কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। এই পাঁচজন বাংলা গানে আধুনিক ধারার প্রবর্তনের যুগের এবং সামসময়িক। এঁদের প্রত্যেকের গানেই কম-বেশি আধুনিকতার প্রকাশ ঘটেছে। এঁরা সামসময়িক কালের হলেও বিষয় ও সুর-বৈচিত্র্যে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র।

রবীন্দ্রনাথের আগে পর্যন্ত বাংলা গানে বিষয়ের এবং সুরের এই অভিনবত্ব ছিল না। রবীন্দ্রনাথের গানেই প্রথম আধুনিকতার প্রকাশ ঘটে। তা যতটা না সুর-বৈচিত্র্যে; তার চেয়ে অধিক বিষয়-বৈচিত্র্যে। তাঁর গানেই প্রথম মানুষের মানবিক আবেদনের প্রকাশ ঘটে। গানে যে রোমান্টিকতার চর্চা; নর-নারীর প্রেম-ভালবাসার প্রকাশ তা রবীন্দ্রনাথের গানেই প্রথম পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের *স্বদেশ* ও *পূজা* পর্যায়ের গানগুলো বাদ দিলে অর্থাৎ *প্রেম, প্রকৃতি* ও *বিচিত্র* পর্যায়ের অধিকাংশ গানেই মানবিক অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গানই ধ্রুপদাঙ্গের সুরে সমৃদ্ধ হলেও তা গতানুগতিক নয়। তাছাড়া পাশ্চাত্য সংগীতের নানা অনুষঙ্গ ব্যবহার করে তিনি সুর-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন। এ-সব বিচারে বলা যায় রবীন্দ্রসংগীতই আধুনিকতার লক্ষণযুক্ত প্রথম বাংলা গান।

বাংলা গানে আধুনিকতার প্রবর্তনে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। সে-সময়ে আগে থেকেই সমাজে গানের যে রীতি প্রচলিত ছিল, সকলেই সাধারণত সেই ধারার মধ্যে থেকেই গান রচনা করতেন। তাঁদের সুরের ভিত্তি ছিল পূর্ববর্তীকালের প্রচলিত গানের সুর। রবীন্দ্রনাথের মত দ্বিজেন্দ্রলাল সুরসৃষ্টির ক্ষেত্রে পৃথক রীতি অনুসরণ করেছেন। রাগ-সংগীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য সংগীতের সুরের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বাংলা গানে অভিনবত্ব এনেছেন। এ প্রসঙ্গে কালিদাস রায় লিখেছেন– 'সঙ্গীতের এই প্রাণোচ্ছল শক্তি আমাদের দেশে ছিলো না। দ্বিজেন্দ্রলাল এই প্রাণশক্তি ইউরোপীয়ো সঙ্গীত থেকে আত্মসাৎ করে বাংলা গানে সঞ্চার করেছেন। বিলাতি সুরে যাকে বলে movement, তা দ্বিজেন্দ্রলালই প্রথম এদেশের সুরে প্রবর্তন করেন। আমাদের দেশে সুরের বিস্তার হয় সচরাচর ধীরে সুস্থে, উদ্দীপনা বা উন্মাদনায় নয়। দ্বিজেন্দ্রলালই লক্ষ্য করেন– উন্মাদনার বা মাতামাতিরও সার্থকতা আছে, এতে স্বরগ্রামের পরিধি বা পরিসর বিস্তৃত হয় এবং এতে সুরের মধ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার হয়।'

রোমান্টিক কবি হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলালের যে বিশিষ্টতা তার নিবিড় পরিচয় ঘটেছে তাঁর গানে। তাঁর গানের সুরের মূল ভিত্তিই হল রাগ-সংগীত। তার সঙ্গে কীর্তনসহ নানা লোকসুরেরও মিশ্রণ ঘটিয়েছেন তিনি। সুরপ্রয়োগ রীতিতে তিনি আবহমান সুরকলায় সম্পৃক্ত ছিলেন। নিধুবাবু প্রবর্তিত টপ্পার ঢঙে তিনি গান গেঁথেছেন। কোন কোন প্রেমের গানে তিনি পাশ্চাত্য সুরের ধারাকে আত্মস্থ করেছেন। তাঁর প্রেমের গানে দ্বিজেন্দ্রলাল গভীর বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন অঙ্কিত করেছেন। বিষয়ের দিক থেকে তিনি নিধুবাবু, কালী মির্জা, শ্রীধর কথক, আশুতোষ দেব, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রমুখেরই অনুগামী। নর-নারীর প্রেম সম্পর্কের অন্তরালে লুক্কায়িত এক পরম বোধ তাঁদের মত তাঁরও অনুভব্য বিষয়। বিচ্ছেদবোধের প্রকাশে তাঁদের মত তাঁরও বাণীমূর্তি এক মহিমাময় উজ্জ্বলতা লাভ করেছে। বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রেম ও প্রকৃতিকে মিলিয়ে যে এক সুদূর গভীর হৃদয়াবেগ প্রকাশের সূচনা করেছিলেন, তাকে তিনি আরও অতলস্পর্শী করে তুলেছিলেন।

দিলীপকুমার রায় তাঁর *উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল* বইয়ে দ্বিজেন্দ্রলালকে আধুনিক বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সুরকার বলেছেন। অন্যত্র তিনি বলেছেন– 'দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন গানের এক দিকপাল– ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, কীর্তন, বাউল ও বহুভঙ্গম প্রেমের গানে, স্বদেশী গানে তাঁর দান যে অসামান্য আজ সবাই তা স্বীকার করেন।'

বাংলা কাব্যগীতির ধারায় রজনীকান্তেরও বিশেষ অবদান রয়েছে। আধুনিক বাংলা গানে মানবিক প্রেম মুখ্য বিষয় রূপে পরিগণিত। বিশেষ করে নিধুবাবুর পর থেকে বাংলা কাব্যগীতিতে নর-নারীর ভালবাসা মুখ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। মূলত ভক্তিগীতি রচয়িতা হিসেবেই রজনীকান্তের পরিচিতি মুখ্য। রজনীকান্তের গান ঐকান্তিক অমৃত তৃষ্ণার গান, প্রেমের গান তিনি বেশি লেখেননি। 'স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি রেখেছি স্বপনে ঢাকিয়া', 'মধুর সে মুখখানি কখনও কি ভোলা যায়'– ইত্যাদি অল্প কিছু প্রেমের গান তিনি রচনা করেছিলেন। তবুও তাঁর গানে, গানের সুরে ও বাণীতে– বিশেষ করে সুরে– আধুনিকতার ছোঁয়া স্পষ্ট। যা থেকে উত্তরকালের সুররচয়িতারা আধুনিকতার ঈশারা পান।

বাংলা কাব্যগীতির ধারাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন অতুলপ্রসাদ সেন। দেশপ্রেম, ভক্তিভাব এবং মানব-মানবীর পার্থিব ভালবাসা তথা হৃদয়ের গভীর আকুতিই তাঁর গানের প্রধান বিষয়। তাঁর গানকে বলা হয় বেদনার প্রমূর্ত বাণী। পাশ্চাত্য সংগীতের ঢঙ তিনি তাঁর গানে অনুসরণ করেননি। তাঁর গানের মূল প্রেরণার বিষয় ছিল ঠুংরি। ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পার ধারা আগেই বাংলা গানে প্রভাব ফেলেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রধান প্রেরণার বিষয় ছিল ধ্রুপদ। দ্বিজেন্দ্রলাল খেয়াল, টপ্পা এবং পাশ্চাত্য সংগীতে প্রভাবিত ছিলেন। আর অতুলপ্রসাদের মুখ্য প্রেরণার বিষয় ছিল হিন্দুস্তানি রাগ-সংগীত তথা ঠুংরি এবং বাংলা লোকসংগীত। হিন্দুস্তানি গানের ঢঙকে গভীরভাবে আত্মস্থ করে তিনি তা বাংলা গানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। ঠুংরি গানের চটুল ও মনোরম চালকে বাংলা গানে যথাযথ ব্যবহরের মাধ্যমে তিনি বাংলা কাব্যসংগীতকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলা লোকসংগীত ও কীর্তনের ঢঙে প্রথম সংগীত রচনার পথিকৃৎও ছিলেন তিনি। নজরুলেরও আগে তিনি প্রথম বাংলায় গজল রচনা করেন।

অতুলপ্রসাদের গানে হিন্দুস্তানি সংগীতের প্রয়োগ ও প্রভাব সম্পর্কে দিলীপকুমার রায় লিখেছেন– 'অতুলপ্রসাদের গানের আমি ভক্ত প্রধানত এই জন্য যে তিনি হিন্দুস্তানি ঢঙ তাঁর অনেক বাংলা গানেই আমদানি করেছেন। একথা বোধহয় অত্যুক্তি নয় যে, বর্তমানকালের বাংলা কবিদের মধ্যে এ ঢঙকে বাংলা গানে সবচেয়ে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন অতুলপ্রসাদ।'

নিধুবাবুই প্রথমে ওদিকে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বর্তমান সময়ে বাংলা গানে হিন্দুস্তানি সংগীতের শুধু সুর নয়, সূক্ষ্ম ঢঙের সঙ্গে বাংলার কবিত্বের সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্য হয়েছে বোধহয় অতুলপ্রসাদের এই হিন্দুস্তানি চালের গানে। নর-নারীর মানবিক আবেগ-উচ্ছ্বাস, প্রণয়-বিরহ নিয়ে অতুলপ্রসাদ প্রায় শতাধিক গান রচনা করেছেন। তাঁর গানে বিরহের সুগভীর আর্তি প্রকাশিত। হিন্দুস্তানি রাগ-সংগীত, বিশেষ করে ঠুংরি এবং বাংলা লোকসংগীতের সুর প্রয়োগ করে তিনি তাঁর গানকে গভীর ব্যঞ্জনা দান করেছেন। অতুলপ্রসাদের সংগীতের সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রসঙ্গে কনক দাশ বলেছেন– 'অতুলপ্রসাদের গান তাই স্বমহিম। তাঁর গানের অলঙ্কার– সারল্যময় অথচ মাধুর্যময় প্রকাশ, আঙ্গিক ও সুর। এর সঙ্গে মিশ্রণ ঘটেছে ভাবের গভীরতা। ওই গভীর ভাব তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে হৃদয়ের সবচেয়ে শাশ্বত দুঃখকে আমাদের কাছে বারবার ফিরিয়ে দেয়। অতুলপ্রসাদের সুরপরিমণ্ডলের মিলিত সেই দুঃখ, সেই বিষাদ, সেই কারুণ্য আঘাত করে ফেরে প্রণয়াস্পদের সন্ধানে কোনও একাকী মানুষকে। তাই তাঁর গান দুঃখ-কারুণ্য-বিষাদের পর জাগতিক সব কিছুর ওপরে পরম প্রেমের রাজত্বে অবাধ বিচরণ।'

বাংলা গানে আধুনিকতার সূত্রপাত কোন এক নির্দিষ্ট সাল কিংবা তারিখ বা দিন-ক্ষণে ঘটেনি। সেটা সম্ভবও নয়। সমাজে বিদ্যমান ধারায় বিদ্যুৎ চমকের মত দৈবাৎ কোন নতুনত্ব ক্ষণপ্রভা দান করে মিলিয়ে যায়। কালের দাবিতে তা ধীরে ধীরে চিন্তাশীলের চেতনায় বাঁধা পড়ে। তারই পরিশীলিত স্থায়ী রূপটি জনমনে প্রভাব বিস্তার করে এবং স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করে। বাংলা গানে আধুনিকতার ছোঁয়া কবে লেগেছিল, তা আর দিন-ক্ষণ-তারিখ মেপে আবিষ্কারের বা বলার উপায় নেই। তবে সর্বজনীন কোন ঐতিহ্যের বিষয় এবং অধ্যাত্ম চেতনা থেকে গানের বাণী ও গতানুগতিক প্রচলিত সুর

থেকে বাংলা গান যেদিন মুক্তি পেল সেদিন থেকেই বাংলা গানে আধুনিকতার হাওয়া লাগল বলা যায়। রামপ্রসাদ সেনের আগে পর্যন্ত বাংলা গানে ব্যক্তি-মানুষের উপস্থিতি ছিল না। রামপ্রসাদের গান শ্যামাসংগীত হলেও তার সব গানের বিষয় আধ্যাত্মিকতা ছিল না। অধিকাংশ গানে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, দারিদ্র্য, অভাব-অনটনের প্রকাশ ঘটেছে এবং সুরেরও স্বকীয় ঢঙের প্রকাশ ঘটেছে। সে অর্থে বাংলা গানে আধুনিকতার ছোঁয়া রামপ্রসাদের গানেই প্রথম পাওয়া যায়। রামনিধি গুপ্ত তাকে আরও প্রাণের করে তুললেন মানবীয় আবেদনে এবং টপ্পা গানের সুর-বৈচিত্র্যের মহিমায়। সূচনা করলেন নতুন ধারার। তার উত্তরসূরী কালী মীর্জা, শ্রীধর কথক এঁদের হাতে এই আধুনিকতা আরও গূঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা পেল। সেই অর্থে কথা ও সুরের সামঞ্জস্য বিধান করে বাংলা গানে আধুনিকতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটালেন সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ। এ ধারার উৎকৃষ্ট রূপটি ফুটে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের গানে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানের আধুনিকতার পথিকৃৎ। আধুনিক বাংলা গানের বিকাশের কালে বাংলা প্রেম-সংগীতের প্রতিরূপে বিরাজিত ছিল রবীন্দ্রনাথের রচনা। সুর ও পদ-গৌরবে বাংলা কাব্যগীতি ভাণ্ডারে এ গান এক অক্ষয় সম্পদ। কিন্তু এ গানের সঙ্গে সাধারণ শ্রোতার সহমর্মিতা ছিল কম। সুর ও বাণীর পরিশীলনে, ভাবগ্রহিতার উচ্চতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেম-সংগীতকে এমন এক লোকে পৌঁছে দিয়েছিলেন যে সাধারণ শ্রোতার সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না বললেই চলে। রবীন্দ্রনাথের গানের রসাস্বাদনের জন্য যে ধরনের বৈদগ্ধ্যের প্রয়োজন, তা সাধারণ শ্রোতার কাছে আশা করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের পরিণত প্রেম-সংগীত নির্বিশেষ ভালবাসার গান। ব্যক্তির প্রাণস্পন্দন সেখানে নিখিল মানুষের প্রাণস্পন্দনে গভীরভাবে মিশে গেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল বা অতুলপ্রসাদের প্রেম-সংগীতও সাধারণ শ্রোতার চিত্তকে তেমনভাবে উদ্বেল করতে পারেনি।

সেই অর্থে বাংলা গানে আধুনিকতার পরম উৎকর্ষ সাধন করেন কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি গভীরভাবে যুগ ও শ্রোতৃচিত্ত সচেতন ছিলেন। সাধারণ মানুষের প্রাণের দাবির প্রতি সহমর্মিতা ছিল তাঁর প্রতিভার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। শ্রোতার প্রাণের দাবিকে প্রাধান্য দিয়েই তিনি গান রচনা করেছেন। তাঁর গানের প্রধান বিষয় ছিল নর-নারীর প্রেম বা প্রণয়। নজরুলের প্রেম-সংগীতের একটা বিপুল অংশের সুর প্রাণবন্ত, উচ্ছ্বাসময়, প্রবল আবেগের ব্যঞ্জনায় পূর্ণ। এই সুর দ্রুত গতিতে শ্রোতৃচিত্তকে সজাগ করে তোলে। পূর্ববর্তীদের গান গতিতে গম্ভীর, তালছন্দ সেখানে গানের ব্যঞ্জনা অনুযায়ী বিলম্বপ্রবণ। কিন্তু নজরুলের প্রেম-সংগীত তালাঘাতে চঞ্চল, সে গানের তালছন্দে প্রেমস্পৃষ্ট হৃদয়ের ব্যাকুল দোলাকে অনুভব করা যায়। তাই দেখা যায় যে ভাব রূপায়ণে, সুর যোজনায় ও তালছন্দ গঠনে নজরুলের প্রেম-সংগীত পূর্ববর্তীদের রচনাধারা থেকে পার্থক্যবিশিষ্ট। বাংলা গানে আধুনিকতার পরম উৎকর্ষের একটা পটভূমি রয়েছে। উনিশ শতকের শুরু থেকেই (১৯০১ সালে) 'গ্রামোফোন কোম্পানি' ব্যবসা শুরু করে; এর কিছুকাল পরে (১৯২৭ সালে) প্রতিষ্ঠিত হয় কলিকাতা বেতার কেন্দ্র, ১৯৩১ সালে কলকাতায় শুরু হয় সবাক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ। এই ত্রিমুখী চাহিদার পটভূমিতে বাংলা কাব্য-সংগীতের আধুনিক ধারার বীজমন্ত্রটি শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে আত্মপ্রকাশ করে স্বমহিমায়। বাংলা গান রচনার ক্ষেত্রে 'গ্রামোফোন কোম্পানি' শ্রোতার চাহিদা, বাজার মূল্য, ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির প্রতি গভীর গুরুত্ব আরোপ করত। বাংলা গানের রেকর্ড প্রকাশের পূর্বশর্তই ছিল তা শ্রোতার কাছে আদরণীয় এবং শ্রবণসুখকর হবে কি না তা বিবেচনা করা। অর্থাৎ সামসময়িক যুগের চাহিদার মূল্যায়ন করে সংগীত নির্বাচন করা।

উনিশ শতকের প্রথম দুটি দশক এভাবে শ্রোতার পছন্দ-অপছন্দকে কেন্দ্র করে বিশেষভাবে 'গ্রামোফোন কোম্পানি'গুলোর ব্যবসায়িক সাফল্যকে প্রাধান্য দিয়ে গান রচনায় আধুনিক ধারার একটা নতুন উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। এ সময় 'গ্রামোফোন কোম্পানি'কে কেন্দ্র করে নতুন নতুন গীতিকার ও সুরকারের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা কোম্পানির ব্যবসায়িক সাফল্যের লক্ষ্যে শ্রোতার পছন্দ-অপছন্দের কথা বিবেচনাপূর্বক একপ্রকার ফরমায়েশি বাংলা গান রচনা শুরু করেন এবং একটি সাংগীতিক আধুনিকায়ন বাণিজ্যিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। এমনি পরিস্থিতিতে ১৯২৮ সালের শেষের দিকে 'গ্রামোফোন কোম্পানি'র সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের সংযোগ ঘটে। এরপর নজরুলকে কেন্দ্র করেই কালক্রমে বাংলা রেকর্ড সংগীতের এক স্বর্ণযুগ রচিত হয়। নজরুলের আবির্ভাবে বাংলা গানের আধুনিকীকরণে এক নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটে।

'গ্রামোফোন কোম্পানি'র সঙ্গে যুক্ত হবার সময় থেকেই নজরুল রাগ-সংগীত সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ব্যাপারে তৎপর হয়ে ওঠেন। অবশ্য এর আগেই তিনি রাগ-সংগীতে কিছুটা দক্ষতা অর্জন করেন। 'গ্রামোফোন কোম্পানি'র তৎকালীন চিফ ট্রেনার ও বিখ্যাত কলাবৎ, বিশেষত ঠুংরির অদ্বিতীয় রূপকার ওস্তাদ জমীরউদ্দিন খাঁর কাছে নজরুল রাগ-সংগীতে কিছুদিন তালিম নেন। এ বিষয়ে তিনি নজরুলকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন।

ত্রিশের দশকে বাংলা কাব্যগীতির পরিপ্রেক্ষিতে রাগ-সংগীত রূপায়ণের যে ধারার সূচনা ঘটেছিল কাজী নজরুল ছিলেন তার মুখ্য রূপকার। ভাঙা খেয়াল, বাংলা খেয়াল ও রাগপ্রধান গানের সূচনার মাধ্যমে তিনি বাংলা কাব্যগীতির ধারায় রাগ-সংগীত রূপায়ণের ঐতিহ্যকে দূরপ্রসারী প্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে বাংলা রাগপ্রধান গানের গোড়াপত্তনই ছিল তাঁর মহত্তম কর্ম। অপ্রচলিত ও লুপ্তপ্রায় গানের প্রচলন এবং নবরাগ রচনা উভয়ই রাগপ্রধান সংগীতপ্রবাহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। নজরুলের সংগীতজীবনের বেতার পর্বে (১৯৩৯ সালে নজরুল বেতারে যোগদান করেন) তাঁর রাগসংগীত ভাবনা একটি পরিণত পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়।

নজরুলের আাধুনিক গানের কাব্যিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মানবীয় প্রেম-বিরহ, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার প্রকাশ সম্পূর্ণ পার্থিব। কোন অতীন্দ্রিয়লোকের চিন্তা-চেতনা এই মিলন-বিরহে কোনরূপ প্রভাব ফেলতে পারেনি। কামনা-বাসনার তপ্ত স্পর্শে নজরুলের আধুনিক গান যেন দীপ্তিময় ও জ্যোতির্ময়। সুরের দ্যোতনায় সেই জ্যোতি নর-নারীর মিলন-বিরহে প্রজ্জ্বলিত হয় উপলব্ধি ও স্পর্শে, যেন বাস্তবতার স্বাদ গ্রহণ করে। নজরুলের এ ধরনের গানগুলো বেশিমাত্রায় পার্থিব নর-নারীর তাজা প্রেমকাব্য। পাওয়া না-পাওয়ার আকুতি মানবমনে যে শিহরন ও অতৃপ্ত বাসনার উদ্রেক ঘটায়, নজরুলের আধুনিক গান তারই জীবন্ত রূপ।

সুর-সঙ্গতির সঙ্গে বাণীর সামঞ্জস্যও লক্ষ্যণীয়। বাণীর সঙ্গে রাগ, সময়, ভাব, রূপ, চিত্র ইত্যাদি নজরুলের আধুনিক গানের কাব্য-সুষমা ও সুর-ব্যঞ্জনায় এক নব সংযোজন। সুরকে কেন্দ্র করেই আধুনিক গানের যাত্রা শুরু। কথা সেখানে মুখ্য নয়, গৌণ। সুর ভাবনা ও সুর পরিকল্পনা শাস্ত্রীয় সংগীতের কঠোর নিগড়চ্যুত হয়ে গীতের কাব্যে প্রবেশ করে কাব্যিক মূল্যকে তীব্রভাবে সুরের অনুষঙ্গে প্রকাশ করে– এটাই আধুনিক গানের লক্ষণ। এই লক্ষণকে কেন্দ্র করে আধুনিক গানের গোড়াপত্তন।

আধুনিক গান কোন এক বিশেষ ঘরানার শ্রেণিভুক্ত নয়। ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, লোকগীতি, প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও মধ্যপ্রাচ্যের নানা সুরের চূর্ণিত রূপই আধুনিক গান। নজরুলের আধুনিক গানের সুর-বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির জন্য কোন্ কোন্ উৎস থেকে নজরুল সুরের প্রভাব গ্রহণ করেছেন, তা জানা দরকার। নজরুলের গানে কথার চেয়ে সুরের আকর্ষণ বেশি। রবীন্দ্রনাথের সুরাদর্শের সঙ্গে নজরুলের সুরাদর্শের এক মস্ত বড় বৈসাদৃশ্য এখানে যে, রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় রাগ-সংগীতের যেটা আদিরূপ– ধ্রুপদ– তার প্রভাব স্বীয় সংগীত রচনার পদ্ধতি-প্রকরণের ভিতর ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু খেয়াল-ঠুংরির সুরভঙ্গির প্রতি তেমনভাবে আকৃষ্ট হননি। পক্ষান্তরে, নজরুল ধ্রুপদের প্রতি বিমুখ, খেয়াল-ঠুংরিতে দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপে আসক্ত। উভয়ের গানের চাল বিচার করলেই এই মূলগত পার্থক্যটি ধরতে পারা যায়।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে যে অগণিত সংখ্যক ব্রহ্ম-সংগীত রচনা করেছিলেন তা হিন্দুস্তানি ধ্রুপদের কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে। মধ্য বয়সের বহু গানে ধ্রুপদাঙ্গ পদ্ধতি অনুসৃত। রবীন্দ্র-সংগীতের বাঁধুনিতে যে কথার ভূমিকা প্রধান, সুরের ভূমিকা সেই তুলনায় অনেক গৌণ, রবীন্দ্র-সংগীতে যে সুর বিস্তারের স্বাধীনতা স্বীকৃত নয়, তার একটা মুখ্য হেতু হল রবীন্দ্রনাথের গানের উপর ধ্রুপদাঙ্গ সুরাদর্শের আত্যন্তিক প্রভাব।

কিন্তু নজরুলের গানের জগৎ আলাদা। যেহেতু তিনি রাগ-সংগীতের সৃষ্টিশীল মুসলমানি ঐতিহ্যকেই বেশি মূল্য দিয়েছেন এবং খেয়াল-ঠুংরির সুর বিস্তারের অর্থাৎ সুরকে যদৃচ্ছ খেলাবার স্বাধীনতা মেনে নিয়েছেন, সেই কারণে তাঁর গানে সুরের মজা বেশি, নজরুল বহুসংখ্যক গীত গজল কাওয়ালি নাত লাওনি শ্রেণির গান রচনা করেছেন– তারও মূলে আছে তাঁর

বাংলা গানে রবীন্দ্রনাথকে আধুনিকতার রূপকার বললেও, বাংলা গানে আধুনিকতার উৎকর্ষ সাধন সবচেয়ে বেশি অবদান নজরুল ইসলামের। তিনি রাগপ্রধান, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, কাওয়ালি, দেশি ও বিদেশি লোকসংগীত, বর্ধমান অঞ্চলের লোকগীতি, সাঁওতালি সুর, পাশ্চাত্য ও মধ্য প্রাচ্যের সুর প্রভৃতি আত্মস্থ করে বাংলা গানে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন নতুনভাবে, নতুনরূপে; বৈচিত্র্যের মাধ্যমে।

উত্তর ভারতীয় মুসলমানি গীতরীতির প্রতি অসীম প্রাণের প্রীতি। রবীন্দ্র-অনুসৃত ধ্রুপদের সুরাদর্শের ভিতর সুরের বিশুদ্ধি আছে কিন্তু সুরের উচ্ছলতা নেই। ধ্রুপদ বড় বেশি শাস্ত্রানুসারী। ধ্রুপদ ভেঙে যে খেয়াল সংগীতের জন্ম হয়েছিল তার কারণই হল ধ্রুপদের আঁটোসাঁটো বন্ধনে আর শিল্পীদের তৃপ্তি হচ্ছিল না, তাঁরা নতুনতর গীতিরীতির ভিতর আত্মপ্রকাশের স্ফূর্তি খটুজছিলেন। খেয়ালের পথ ধরে একে একে দেখা দিল ঠুংরি-টপ্পা-গীত-নাত-কাওয়ালি প্রভৃতি শ্রেণির গান। নজরুল এ ধারারই যোগ্য উত্তরসূরী এবং প্রয়োগকর্তা। সুভাষচন্দ্র চন্দ্র বলেছেন– 'নজরুলের সঙ্গীত জীবনের প্রথম অধ্যায় কেটেছে গ্রামোফোনে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা ও সমাপ্তি রেডিওতেই। প্রথম পর্বে কবি যে গানগুলি রচনা করেন সেগুলি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, কিন্তু এগুলির মধ্যে অধিকাংশ সংগীতে রাগের কারুকার্য সূক্ষ্মতম পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। রাগ এবং রাগিণীর হর-পার্বতী মিলন ঘটেছে দ্বিতীয় পর্বে।'

এক পর্যায়ে নজরুল দেশি-বিদেশি লৌকিক সুর অবলম্বনে গান রচনার প্রতি আকৃষ্ট হন। বিশেষ করে বৈদেশিক সুর প্রয়োগের ক্ষেত্রে নজরুল বাংলা গানে নতুন মাত্রার সংযোজন করেন। এর আগে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁদের কিছু গানে পাশ্চাত্য সংগীত রীতির ব্যবহার করেছেন। কিন্তু নজরুল আকর্ষণ বোধ করেছেন মধ্যপ্রাচ্যের সংগীতের প্রতি, দূর লাতিন আমেরিকার সংগীতের প্রতি। নজরুল ইরানি, আরবীয়, তুর্কি, কিউবান, মিশরীয় প্রভৃতি সুরের কিছু ঢঙ ও লয়ের দোলাকে তাঁর কোন কোন গানে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে ব্যবহার করেন। কিউবার নৃত্য-সংগীতের সুরে রচিত 'দূর দ্বীপবাসিনী', মিশরীয় নৃত্য-সংগীতের সুরে রচিত 'মোমের পুতুল মমির দেশের মেয়ে নেচে আয়', আরবীয় সুরে রচিত 'রুম ঝুম ঝুম ঝুম, রুম ঝুম ঝুম', 'শুকনো পাতার নূপুর পায়ে', 'চমকে চমকে ধীর ভীরু পায়' ইত্যাদি গানে নজরুলের বৈদেশিক সংগীতরীতির প্রয়োগের নিদর্শন পাওয়া যায়।

বৈচিত্র্যের ক্ষুধা ছিল নজরুলের দুর্নিবার। কোন এক শ্রেণির গানের সীমায় তিনি নিজেকে বেঁধে রাখেননি, এক শ্রেণির গানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্ব যখন শেষ হয়েছে, তখন তার গণ্ডীর মধ্যে অচল-প্রতিষ্ঠ না থেকে অন্য শ্রেণির গানে মন দিয়েছেন এবং কিছুকাল পরে তা থেকে আরেক নতুন শ্রেণির গানে উত্তরিত হয়েছেন। এভাবে চলেছে স্তর থেকে স্তরান্তরে, অধ্যায় থেকে অধ্যায়ন্তরে বিবর্তনের প্রক্রিয়া। কথা ও সুরের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম সাধিত হয়েছে নজরুলের আধুনিক গানে। কথাকে খর্ব করে সুর নয়, আবার সুরকে খর্ব করে কথা নয়– এই অঙ্গাঙ্গী মিলনের আদর্শ এই গানগুলোতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই বিষয়, বাণী, সুরের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাংলা গান আধুনিকতায় যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে, তেমনি আধুনিকতায় সমৃদ্ধ হয়েছে নজরুলের গান। নজরুলের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আধুনিক গান– যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই, আমি চিরতরে দূরে চলে যাব, পরদেশি মেঘ যাওরে ফিরে, নয়ন ভরা জলগো তোমার, সুরে ও বাণীর মালা দিয়ে তুমি আমারে ছুটুইয়া ছিলে, পেয়ে কেন নাহি পাই হৃদয়ে মম হে চির সুদূর প্রিয়তম, গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙে যায়, আমায় নহে গো ভালোবাস, মোর না মিটিতে আশা ভাঙিল খেলা, জনম জনম গেল আশাপথ চাহি, মনে পড়ে আজ সে কোন জনমে ইত্যাদি।

'গ্রামোফোন কোম্পানি'কে কেন্দ্র করেই মূলত নজরুলের সাংগীতিক সত্তার প্রকাশ, বিকাশ এবং বিবর্তন। কবির প্রথম রেকর্ডকৃত গান হচ্ছে– 'জাতের নামে বজ্জাতি সব, জাল-জালিয়ত খেলছো জুয়া'। এ প্রথম রেকর্ডকৃত গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন শিল্পী হরেন্দ্রনাথ দত্ত, রেকর্ড নং- পি ৬৯৪৫। ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানির প্রকাশিত রেকর্ড বুলেটিন থেকে এ তথ্য জানা যায়। ১৯২৮ সালের শেষে তিনি 'গ্রামোফোন কোম্পানি'র সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হন এবং তাদের চাহিদা অনুসারে ভুরি ভুরি গান রচনা করে তাতে সুরারোপ করেন। অতুলপ্রসাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনিই প্রথম বাংলা গজল গানকে সমৃদ্ধ করলেন। বাংলা ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ দুটি গজল (সম্ভবত নজরুলের রেকর্ডকৃত প্রথম গজল) হচ্ছে– 'বাগিচায় বুলবুলি তুই/ ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল' (এ গানটি দিলীপকুমার রায় সর্বত্র গেয়ে বেড়াতেন) এবং 'আমারে চোখ ইশারায়/ ডাক দিলে হায় কে গো দরদী'। হিন্দুস্তানি লোক-সংগীতের ঢঙে– কাজরি চালে, পাহাড়ি রাগের আমেজ এনে নজরুল রচনা করলেন তাঁর সেই বিখ্যাত গজল– 'এত জল ও কাজল চোখে/ পাষাণী আনলে বল কে?' যা শুনে মুগ্ধ অতুলপ্রসাদ এর জুড়ি গান রচনা করলেন– 'জল বলে চল্ মোর সাথে চল/ তোর আঁখিজল হবে না বিফল।' তখনও ইসলামি গজল বা ইসলামিক নজরুল গীতি 'গ্রামোফোন কোম্পানি' বের করেনি। কলকাতার ম্যাডান থিয়েটারের প্রধান নাট্যকার-সংগীতকার কাশ্মীরের আগা হাশার রচিত একটি বিখ্যাত গজল গান– 'হাম জায়েঙ্গে ওয়াঁহা খুশ দিলে দিওয়ানা যাহা হো'-র সুরকে নিয়ে নজরুল রচনা করলেন বাংলা ভাষায় ইসলামি গান বা গজল গান– 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে/ এলো খুশির ঈদ।'

বর্ধমান-বীরভূমের ঊষর অঞ্চলে কাজী নজরুলের জন্ম, বেড়ে ওঠা, প্রাথমিক শিক্ষা এবং কৈশোরযাপন। ফলত সে অঞ্চলের মাটির গন্ধ লেগে আছে তাঁর নাড়িতে। নজরুলের বহু গানে সে অঞ্চলের লোকসংগীতের প্রভাব স্পষ্ট। এ রকম কয়েকটি গান– 'রাঙা মাটির পথে লো মাদল বাজে, বাজে বাঁশের বাঁশি', 'তেপান্তরের মাঠে বঁধু হে, একা বসে থাকি', 'লাল টুক টুকে বউ যায় লো, লাল নটের ক্ষেতে লো, লাল নটের ক্ষেতে।'

বর্ধমান অঞ্চলের সাঁওতালদের জীবনমানের মধ্যে কুড়িয়ে পেলেন যে গানের সুর তা থেকে নজরুল তৈরি করলেন ঝুমুর গান। এই ঝুমুর গানের সুর আজ বাংলাদেশের অতি রসাত্মক ও প্রিয় সুর। চপল গতিতে নাচের নেশায় ঝুমুর এল মহুয়া মদের গোলাপি নেশায় দিগ্‌অঞ্চল মাতিয়ে। এমনি একটি ঝুমুর গান– 'চুড়ির তালে নুড়ির মালা রিনিঝিনি বাজে লো/ গলায় দোলে বুনো ফুলের মালা'।

বাংলা গানে আধুনিকতার যে সূত্রপাত ঘটেছিল রামপ্রসাদ-নিধুবাবু-শ্রীধর কথকের হাতে, তা পরিশীলিত সৌষ্ঠব রূপ পেল রবীন্দ্রনাথের গানে। গানের সুর ও বাণী পেল গতানুগতিক ধারা থেকে মুক্তি। আর দ্বিজেন্দ্রলাল-অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্ত হয়ে নজরুলে এসে গান পেল বৈচিত্র্যের স্বাদ। রবীন্দ্রনাথের গান ধ্রুপদ ও পাশ্চাত্য সংগীতের সুরের নিগড়েই বাঁধা পড়ে গেল। আর নজরুল হিন্দুস্তানি-উত্তর ভারতীয় খেয়াল-ঠুংরির চাল অত্মস্থ করে গানে আরও প্রাণের সঞ্চার করলেন। সে অর্থে বাংলা গানে রবীন্দ্রনাথকে আধুনিকতার রূপকার বললেও, বাংলা গানে আধুনিকতার উৎকর্ষ সাধন সবচেয়ে বেশি অবদান নজরুল ইসলামের। তিনি রাগপ্রধান, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, কাওয়ালি, দেশি ও বিদেশি লোকসংগীত, বর্ধমান অঞ্চলের লোকগীতি, সাঁওতালি সুর, পাশ্চাত্য ও মধ্য প্রাচ্যের সুর প্রভৃতি আত্মস্থ করে বাংলা গানে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন নতুনভাবে, নতুনরূপে; বৈচিত্র্যের মাধ্যমে। উৎকর্ষের মহিমায় সমৃদ্ধিলাভ করল বাংলা গানের নতুন ধারা। রবীন্দ্রনাথ নজরুলের গান সম্পর্কে বলেছেন– 'নজরুলের নিজস্ব একটি জোরালো ধরন আছে'। আর সেই জোরালো ধরনাটাই বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করেছে। নজরুলের গান হয়েছে কালোত্তীর্ণ।

সন্তোষ ঢালী শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

পাসিং শো

অমর মিত্র

জীবনের এক একটা সময় আসে এক একরকম হাওয়া এসে ঝাপ্টা মারে। কত রকম রঙ তার ভিতরে! অতীনের মনে পড়ে, কত রকম সাবান, তেল, স্নো-পাউডার, সেন্ট, শ্যাম্পু যে উধাও হয়ে গেছে বাজার থেকে। কত রকম সিগারেট! আজকাল এই সব আগডুম-বাগডুম মনে হয় অতীনের। পুরনো নাম মনে পড়ে। লাক্স, লাইফবয়, হামাম, লক্ষ্মীবিলাস, জবাকুসুম, হিমানি স্নো, কিউটিকুরা ট্যালকম পাউডার, চারলি সেন্ট, কত কী? আছে লাক্স লাইফবয়, কিন্তু তা আর বাড়িতে আসে কই? আর সিজার, নাম্বার টেন, উইন্ডসর, উইলস নেভিকাট, ক্যাপ্সট্যান– সেই সব সিগারেট! মেন্থল দেওয়া মারকোপোলো কিংবা টেক্সাস টুপি মাথায় সায়েবের ছবি দেওয়া পাসিং শো? হাওয়া হয়ে গেছে বেলবটম প্যান্ট, ইউ ছাঁটে চুল কাটা। ফুরিয়ে যাচ্ছে অতীনের যৌবনকাল। কয়েকমাস সে অনেক চেষ্টা করেছিল আটকে রাখতে। হাসি পায় অতীনের। শাদা চুল কালো করতে গিয়ে সব চুল ঝরে গিয়েছে পাশের ফ্লাটের নিলু রায়ের। সে কোথায় গিয়ে কোরিয়ান পদ্ধতিতে চুল লাগিয়ে এসেছে। খোলতাই হয়েছিল চেহারাটা। মুখে বার্ধক্য, মাথার ঘনচুলে যৌবন। রিটায়ার করে ক্রমাগত শীর্ণ হচ্ছে নিলু রায়। হঠাৎ করে ভেঙে পড়ছে যে নীলু তা টের পায় অতীন। এখন বাড়ির বাইরে কদমগাছের ছায়ায় মোল্ডেড প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে থাকে লুঙ্গি আর হাফ শার্ট গায়ে। বুড়ো বাঘ, পথ চলতি একে ওকে ডাক দেয়, অ্যাই পতাপ, সন্ধে বেলায় বসছিস, এই একটা সিগারেট দিয়ে যা তো।

অতীন বসু। ঊনষাট রানিং। রাজ্য সরকার। শোনা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার চাকরির মেয়াদ বাড়িয়ে ষাট থেকে বাষট্টি করবে, তখন রাজ্যও করবে। মানে আরো দু'বছর ঘানি টানা। অতীন বলছিল শম্পাকে, ছেড়ে দেবে, আর কী দরকার, অনেক হয়েছে, আর করবে না। তার ছেলে এখনো দাঁড়ায়নি বটে, কিন্তু সে একদিন দাঁড়াবে। এঞ্জিনিয়ার হয়নি, ইংলিশ অনার্স, এমএ করছে। এখানে ওখানে লিখে বেড়ায়। গিটার বাজায়। মিউজিক কম্পোজ করে। কিছু তো করছে। একেবারে কি বসে থাকতে পারে মানুষ? এইটা বাড়বে ক্রমাগত। কিন্তু একেক সময় বন্ধুপুত্রদের দেখে কি মন খারাপ হয় না অতীনের? তারা সব বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানিতে, টাকার থলে নিয়ে ঘরে ফিরছে। অতীনের ছেলে জল ঘোলা করেই যাচ্ছে। ক্রমশ ঝুঁকির জায়গায় চলে যাচ্ছে। কিন্তু এই কথা তাকে বলতে সে বলেছিল, ঝুঁকি না নিলে কিছু করা যায় বাবা?

অতীন চুপ।

অনীশ, নীল বলেছিল, তোমার পিসতুতো দাদা তো কয়েকটি ভাল উপন্যাস লিখেছেন, খুব ভাল শর্ট স্টোরি লিখেছেন, তাঁর ভাই সিভিল সার্ভিস, কে তোমার কাছে ইম্পরট্যান্ট?

অতীন বলেছিল, দু'জনেই।

একজন ঝুঁকি নিয়েছেন, অন্যজন নেননি, আমি আমার রাস্তায় হাঁটছি বাবা, ক্রিয়েটিভ কিছু করতে গেলে ঝুঁকি নিতে হয় বাবা, জগতে সবাই এঞ্জিনিয়ার হবে?

ছেলের যুক্তির কাছে হেরে গিয়েছিল অতীন। কিন্তু সে তো চেনে বিমলেন্দু পালকে। সিনেমার ভূত তার মাথায় ঢুকেছিল। কিন্তু সারাজীবনে কিছুই করে উঠতে পারেনি। দুটি ফিল্ম বানিয়েছিল। শুধুই পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেছে। কী বলবে তা বুঝে উঠতে পারেনি। একটা ফ্রাস্ট্রেটেড মানুষ। সকলকে গালি দিয়ে বেড়ায়। কেউ কিছুই পারে না। সে সুযোগ পেলে দেখিয়ে দিত, কী ভাবে ফিল্ম করতে হয়। মাঝে মাঝে হাসপাতালে যায় অসুস্থ হয়ে। কত রকম অসুখ যে তার ভিতরে বাসা বেঁধেছে! বউ ইস্কুল টিচার ছিল বলে না খেয়ে মরেনি।

অতীন অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত। অনেক বছর চাকরি করে অনেক টাকা জমিয়েছে। রিটায়ার করলে অনেক টাকা একসঙ্গে পাবে। তাদের অধঃস্তন কলিগ দীনেশ কুণ্ডু একদিন এসে বলল, গাড়ি কিনেছে। দীনেশ আগের বছর রিটায়ার করেছে। প্রায় কাজ না করে, ইউনিয়ন আর বিপ্লব করে পঁয়তিরিশ বছর কাটিয়ে অবসর। তার জীবনের দুটি ঘটনা ইম্পরট্যান্ট, বিবাহ এবং বিচ্ছেদ, তারপর পুনর্বিবাহ। পরের বউটি কচি। তার চেয়ে কুড়ি বছরের ছোট। কুণ্ডু একদিন এসে বলে গেল, গাড়ি কিনেছে, তার জীবনের স্বপ্ন ছিল গাড়ি কেনা, মারুতি জেনে লং ড্রাইভে যায় বউকে নিয়ে। একটু পান করে। দারুন আছে সে, দারুন। পুরনো লোকেরা এখনো খাতির করে। বকখালি, দীঘা, মন্দারমণিতে এখনো কনসেশন পায়, সে লাইসেন্স-ডিপার্টমেন্টের বড়বাবু হয়েছিল শেষের দিকে, ওই ডিপার্টমেন্টে অনেক টাকা।

বিপ্লব? অতীন আচমকা জিজ্ঞেস করেছিল, আগে হলে এই কথার মাশুল গুণতে হত তাকে, এখন দীনেশ নখ-দন্তহীন পশু। তাদের জমানা চলে গেছে। শেষ দেড়বছর দীনেশ কুঁকড়ে ছিল। যদি অনেক বছরের কীর্তির বদলা নেয়। তা হয়নি। এখন দীনেশকে ভয় কম।

কুণ্ডু বলেছিল, বিপ্লব তো হল না, দেখা যাক।

দেখা যাচ্ছে?

কুণ্ডু বলেছিল, একটা দুটো ভুল, ভুলও নয়, কী থেকে কী যে হয়ে গেল, মিসটেক আর মিসটেক, একটা প্রগতিশীল সময় মুছে গেল, বাম পন্থা থাকল না।

তাতে কী হল, একজীবনে তুমি তো সব পেয়েছ?

দীনেশের বাড়ি সল্ট লেকে। নিউ টাউনে আর একটা জমি জোগাড় করেছিল, তার দাম এখন কয়েক কোটি। দীনেশের নতুন বউ সরকারি চাকরি করে। অতীন জানে সে দ্রুত তার আনুগত্য বদলেছে ইউনিয়নে। অতি দ্রুত। সবটাই দীনেশের পরামর্শে। দীনেশও কি তাই করছে নিজের জায়গায়? তারপর সে আবার আগের মত বাঘ হয়ে উঠবে। চাকরিতে নেই, কিন্তু পাড়ায় তো আছে। কী দাপট ছিল দীনেশের? অতীনও ভয় করত দীনেশকে। এই রকম মানুষ তৈরি হয় কঠোর অনুশাসন কায়েমের জন্য। এদের দিয়েই সর্বস্তরে সর্বহারার অনুশাসন কায়েম করতে হয় সর্বহারার উপরে। লোভী, নিষ্ঠুর আর দুর্নীতিপরায়ণ। তাকালেই গা হিম হয়ে যেত। কথা বলত পাণ্ডিত্যের আধার হয়ে। জগতের সব কিছু জানে। অতীন দেখেছে এই এরাই তার যৌবনকাল খেয়েছে। নিংড়ে নিয়েছে। ভাল কাজটি করতে দেয়নি। একবার একটি বিষয়ে সে একমত হয়নি। সৎ এক অফিসারকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করায় সায় দিতে পারেনি, ফলে তাকেও চলে যেতে হয়েছিল সেই বাঁকুড়া জেলার উত্তর পশ্চিমে ন'পাহাড়িতে। চার বছর কাটিয়ে ফেরা। সেই চার বছর ভাল যায়নি। পঞ্চায়েত সভাপতি তাকে হেনস্থা করেছিল। সরকারি ইউনিয়নের নেতা কণ্ঠিধারী এক ব্যক্তি তার সামনে বসে থেকে অহেতু সময় নষ্ট করত, সে যে বিরোধিতা করেই বদলি হয়ে এসেছে সেই খবর পেয়েছিল ঊনষাট বছরের অতীন এখন সব স্পষ্ট মনে করতে পারে। তাদের ইউনিয়ন ছিল অরাজনৈতিক অনেকটাই। সেই ইউনিয়ন ভেঙে দিয়েছিল সরকারি দলের ইউনিয়নের অনুগামীরা। অতীন কোন দলে যাবে, সেই কথা তাকে জিজ্ঞেস করতে রাতে তার ঘরে পার্টির নেতাকে নিয়ে এসেছিল সেই কণ্ঠিধারী। কত কথাই না এখন মনে পড়ে। তার ইচ্ছে হয় আর একবার ফিরে যায় ন'পাহাড়িতে। দেখে আসে সে কণ্ঠিধারী ইউনিয়ন নেতা এখন কতভাবে নাম-গান করছে।

ভর সকালে অতীন বাজারে বেরিয়েছে। পায়জামা-পাঞ্জাবি, হাতে বাজারের থলে। বাইরে চেয়ারে বারমুডা আর হাওয়াই শার্ট পরে নিলু রায় খবরের কাগজ পড়ছে। আসলে তা নয়, বসে মেয়েমানুষ দেখছে নিলু। তাকে একদিন কথাটা বলেছে শম্পা। কী চোখ নিলুর, যেন গিলে খাবে। অনীশের ক্লাস মেট অদ্রিজা এসেছিল অনীশের খোঁজ করতে। সে দীর্ঘাঙ্গী, স্মার্ট, জিনস আর টি-শার্টে উদ্ধত নবীন। নিলুকেই জিজ্ঞেস করেছিল, আঙ্কেল,

অমর মিত্র

অমর মিত্রের জন্ম ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ আগস্ট অধুনা বাংলাদেশের সাতক্ষীরার নিকটবর্তী ধূলিহর গ্রামে। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও পারিবারিক আবহে সাহিত্য তাঁর বিচরণক্ষেত্র হয়ে ওঠে। ২০০৬ সালে *ধ্রুবপুত্র* উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন অমর। এর আগে, *অশ্বচরিত* উপন্যাসের জন্য ২০০১ সালে পান বঙ্কিম পুরস্কার। অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে, শরৎ পুরস্কার (ভাগলপুর, ২০০৪), সর্বভারতীয় কথা পুরস্কার (১৯৯৮), গজেন্দ্রকুমার মিত্র পুরস্কার (২০১০)। বর্তমানে কলকাতা শহরে বসবাসরত অমর মিত্রের সাহিত্যিক জীবনের সূচনা ১৯৭৪ সালে। প্রথম উপন্যাস *নদীর মানুষ* ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয় অমৃত পত্রিকায়।

হারিয়ে একটি গান *পাসিং শো*-র কেন্দ্রবিন্দু। এই উপন্যাস একটি হারিয়ে যাওয়া গান আর হারিয়ে যাওয়া রেকর্ড নিয়ে। মানুষ তার জীবনে যা হারায় তাই বুঝি ফিরিয়ে আনতে চায় এইভাবে। একটি গান রেকর্ড করে যে গায়ক মুছে গেছেন স্মৃতি থেকে, সেই গান বুঝি ফিরে আসে গভীর রাতে, বাতাসে ভেসে কিংবা স্বপ্নের ভিতরে। আশ্চর্য এই কাহিনি যেন হারিয়ে যাওয়া জীবনেরই অন্বেষণ। আর এক অজ্ঞাতপ্রায় শিল্পীর প্রতিরোধে এই উপন্যাস পেয়েছে অনন্য এক মাত্রা। *পাসিং শো* যেন প্রবহমান জীবনের অফুরন্ত এক প্রদর্শন। *পাসিং শো* কলকাতার বিখ্যাত নাটকের দল *সায়ক* নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করছে নিয়মিত।

সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত *ধ্রুবপুত্র* খরাপীড়িত প্রাচীন উজ্জয়িনী নগরের কাহিনি– কবি কালিদাসের *মেঘদূত* কাব্যের এক বিপরীত নির্মাণ যেন। দীর্ঘ এই আখ্যান শেষ পর্যন্ত শূদ্র জাতির উত্থান ও কবির প্রত্যাবর্তনে পৌঁছয়।

আর বঙ্কিম পুরস্কারপ্রাপ্ত *অশ্বচরিত* তথাগত বুদ্ধের ঘোড়া কন্থক ও তাঁর সারথী ছন্দকের কাহিনি। লেখক ভারতীয় প্রতিবেশে জাদু বাস্তবতা ব্যবহার করেছেন এই উপন্যাসে। *অশ্বচরিত* বাংলা উপন্যাসে এক আলাদা রীতির জন্ম দিয়েছে।

অতীন বসু কোন ফ্ল্যাটে থাকেন, এইটাই তো বাইশের সি?

কী দরকার? নিলু তাকে যেন চেটে নিচ্ছিল। কথাটা সে শম্পাকে বলেছিল, আন্টি, ওই লোকটা কে, উফ!

নিলু ডাকল তাকে, এই অতীন?

কী চাই ?

পঁয়তিরিশ নম্বর বাড়ি ভাঙছে, নিবি ফ্ল্যাট?

অতীন বলল, এই কাঁচি সিগারেট কোথায় পাওয়া যায় বল দেখি।

হাঁ হয়ে গেল নিলু। বুঝে উঠতে পারল না কী বলবে। অতীন বোসকে পঞ্চাশ বছরের উপর দেখেও সে বুঝে উঠতে পারল না। তারা যে ফ্ল্যাটে থাকে তা তৈরি হয়েছিল সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময়। বাড়িওয়ালা থাকেন বাগবাজার। তাঁর অ্যাকাউন্টে হাউজ রেন্ট ফেলে দেয় অতীন। শুনেছে নিলু দেয় না। মূল গৃহস্বামী মৃত। তাঁর উত্তরাধিকারীদের ভিতরে গোলমালের সুযোগ নিয়েছে নিলু। বিষয়টা অহেতুক জটিল করে তোলায় নিলুর ভূমিকা কম নয়। সে ছিল কোর্টের পেশকার। যে কোন বিষয়ে প্যাঁচ লাগিয়ে দিতে ওস্তাদ। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, পরিবারে পরিবারে কলহ লাগিয়ে দিতে পারে যেমন, ফায়দাও তুলতে পারে খুব। নিলু বলল, কাঁচি মারচিস অতীন?

অতীন বলল, তোকে কাঁচি মারার সাধ্য আছে আমার? এই জবাকুসুম তেল পাওয়া যায় এখন?

শালা তুই বাস্কো থেকে বের করচিস, জবাকুসুম কী হবে?

মাথা ঠাণ্ডা করব?

কেন প্রেশারের অষুধ খা, আগের দিনে ওসব ছিল না তাই জবাকুসুম, লক্ষ্মীবিলাস চলত, ওসব এখন চলে না, শুধু শ্যাম্পুর বাজার।

অতীন বলল, পাসিং শো সিগারেট?

খ্যা খ্যা করে হেসে ওঠে নিলু রায়, ভোগে গেছে সব, আরে কাঠপুতলির কথা মনে আছে তোর, ছেচল্লিশ নম্বর বাড়ি।

চমকে ওঠে অতীন, অপরূপা?

ইস, তোর মনে আছে, আমরা কাঠপুতলি বলতাম, হেবি যন্তর ছিল, শুধু হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম, চেটেও সুখ ছিল।

অতীন এদিক-ওদিক দ্যাখে। নিলুর সঙ্গে সক্কাল বেলায় কী নিয়ে আলাপ করছে সে? কে শুনে ফেলবে! নিজের বয়সকে একটা মর্যাদা দিতে হয় তো। সে বলল, ভাল মেয়ে, কী সুন্দর বাংলা লিখত, কবিতা লিখত ওই বয়সেই, আমি ওকে পড়িয়েছিলাম দু'বছর, ব্রিলিয়ান্ট, ইংলিশেও দারুন ছিল।

কিন্তু লাইন তো করতে পারিসনি। বলে হ্যা হ্যা করে হাসল নিলু, বলল, শালা কাঠপুতলি থাকে বিলেতে, মানে কানাডা, এয়েচিল।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে অতীন। মেয়েটি একটু পুতুল পুতুল ছিল। সেই বয়সে তারা কাঠপুতলি শব্দটি পেয়েছিল ডোমপাড়ার নেপাদার কাছ থেকে। নেপাদা পুতুল নাচাত। ওই পুতুল নাচিয়ে নাকি প্যারিস গিয়েছিল। তার একটি কাঠের পুতুলের চোখ ছিল অপরূপার মত হয়তো। তাই কী? মনে নেই। নাকি অপরূপা হাঁটত কাঠের পুতুলের মত একটু দুলে দুলে। অতীন জিজ্ঞেস করল, ভাল আছে?

আরে ওর বাবা টেঁসেছে বিরানব্বই করে, তাই এয়েচিল টরেন্টো থেকে, মাইরি চেনা যায় না।

কবে এসেছিল?

বিস্যুতবারে, আজ রবি, আজ নিয়মভঙ্গ, নাকি হয়ে গেছে কাল?

যাই। কী মনে করে এগোতে যায় অতীন।

আরে দাঁড়া না, তুই তো মন্নিং ওয়াক করিস, দেখিসনি?

না, আমি তো ওইদিকে যাই না।

হি হি করে হাসে নিলু রায়, কেন রে, কষ্ট হয়?

যাই। অতীন আবার এগোতে যায়। হাত বাড়িয়ে তার কবজি ধরে ফেলে নীলু। বলে, মাইরি, আরো বিউটিফুল হয়েচে, কে বলবে পঞ্চাশ, এখেন দিয়ে বাবলুর সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছিল, কী ফিগার, মাথা ঘুরে যাবে তোর, মাইরি পুরনো সোনা পালিশ করা।

অতীনের মনে পড়তে লাগল সব। সে কেমন উদাস হয়ে আকাশের দিকে তাকায়। তখন নিলু বলল, ওর যে মেয়েটা, আরিব্বাস, একেবারে সেই কাঠপুতলি।

তাই!

হ্যাঁ তাইরে, খোঁজ কর মা-মেয়ে দু'জনকেই দেখতে পাবি।

দুই.

একটু অন্যমনস্ক হয়ে বাজারে গেল অতীন। ভাল নাম অপরূপা, ডাক নাম রূপা। অতীন তখন বি এসসি করে বেকার। এম এসসি হয়নি। হয়নি মানে রেজাল্ট খারাপ, মেরিট লিস্টে আসেনি। চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছে আর হাত খরচের জন্য টিউশানি। তখন সেই মেয়ে ক্লাস টেন। তাকে সে সায়েন্স সাবজেক্ট পড়ায়, আর বাংলাও। অতীন তখন কবিতা লিখত। ছোট পত্রিকায় তার কবিতা বেরিয়েছে কয়েকটা। সত্যি কথা হল, কবিতা তার সর্বনাশ করেছিল। কথাটা ছিল তার নিজের, কিন্তু রূপা মানত না। সে রূপাকে পড়াত সপ্তাহে তিন দিন। অতীন বাজারে গিয়ে দেখল, বাবলু মানে সুহাসকে, রূপার দাদা। মুণ্ডিত মস্তক। কতদিন ওর সঙ্গে কথা হয় না। অতীন তাকায়। সুহাস হাসল, বলল, বাবা নেই, আচমকা, বিনা নোটিসে।

কত বয়স হয়েছিল?

নাইনটি ফাইব, কিন্তু ভালই ছিলেন।

হ্যাঁ, এখন তো নাইন্টি প্লাস অনেকে আছেন, মনোহর আইচ একশো দুই, ব্যাটিং।

সুহাস বলল, আমরাও ওয়েট করছিলাম ফর হিজ সেঞ্চুরি, কিন্তু ঘুমের ঘোরে চলে গেলেন, ব্যাড লাক।

অতীন হাসল। কী বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না। তখন সুহাস বলল, রূপা এসছিল, ও তো টোরেন্টো থাকে, খোঁজ করছিল আপনার।

চলে গেছে?

না ইন্ডিয়া থেকে যায়নি, ওরা গেছে দিল্লি আগ্রা জয়পুর, ওর মেয়ে তো তাজমহল দ্যাখেনি, তাই।

অতীন জিজ্ঞেস করল, কবে ফিরতে পারে?

আমি আপনাকে খবর দেব অতীনদা, তবে ওরা ফিরে বর্ধমান যাবে, শ্বশুরবাড়ি তো রায়না থানায়।

তা তো যাবেই।

আসলে এবার অনেকদিন বাদে এল।

অতীন কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। রূপার প্রেমে পড়েছিল কি সে? মোটেই না। রূপাদের সেই আমলেই ছিল একটি শাদা মরিস মাইনর আর কালো অস্টিন গাড়ি। অস্টিনটা ছিল ওর ঠাকুরদার। তিনি ছিলেন হাই কোর্টের নামজাদা ব্যারিস্টার। রূপার বাবা আইসিআই রঙ কোম্পানির খুব উঁচু পদে। নিজে ড্রাইভ করে অফিস যেতেন। তিনতলা বাড়ি। মেঝেয় সেই আমলেই মার্বেল পাথর। শাদা মসৃণ। পা টিপে টিপে হাঁটতে হত। অনভ্যাসে যে কোন মুহূর্তে পতনের আশংকা। বাড়ির ছেলে মেয়ে সুহাস, রূপা। রূপার উপরে দিদি ছিল, দাদা ছিল। সুহাসের দাদা সুভাষ থাকে ইউ কে। ডাক্তার। সে কি এসেছে? সুহাস বলল, না দাদা আসতে পারেনি অতীনদা। আসলে ওরা এই সময় ইতালিতে মেডিক্যাল কনফারেন্সে। বাৎসরিক কাজে আসবে। আর সোনা? রূপার উপরে? তার কথা জিজ্ঞেস করবে করবে করেও করল না অতীন। সে বিয়ে করেছিল ননীদাকে। ননীদা এ ডিভিশনে ক্রিকেট খেলত। তারপর করত কন্ট্রাক্টরি। একেবারে সাধারণ। সাধারণ নয় অসাধারণ। সাহস ছিল না তাই এগোতে পারেনি অতীন আর সেই ননীগোপাল চন্দ সোনাকে নিয়ে পালিয়েছিল। সুহাসের উচ্চপদস্থ বাবা আর ব্যারিস্টার দাদু হাজার চেষ্টা করেও ননীকে দমাতে পারেনি। সাতদিন হাজতবাস করিয়েছিল ননীকে কিন্তু সোনা বেঁকে বসায় শেষ অবধি হাল ছেড়ে দিয়েছিল। তখন সবে বাম ফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছে। পার্টি ননীর পক্ষে দাঁড়ানোয় কিছুই করতে পারেনি তালুকদার বাড়ি। আর বিশ বছর পরে হলে ননী কি বাঁচত? তালুকদাররাই হয়েছিল পার্টির বড় ভরসা। বউ নিয়ে সিঙ্গরৌলি চলে গিয়েছিল ননী তার দাদার কাছে। সেখানেই কন্ট্রাক্টরি। আসে না। এবার এসেছিল কি? এরা কি খবর দিয়েছিল?

সুহাস বলল, যাই অতীনদা।

হ্যাঁ, ভাল থেক।

ওরা ফিরলে খবর দেব।

ঠিক আছে। অতীন বাজারের শব্জিওয়ালা হ্যাপিকে জিজ্ঞেস করল, সরু, নরম, সেদ্ধ খাওয়ার মত সজনে পাওয়া যায় না?

পেলেই নিয়ে আসব।

আগে তো খুব পাওয়া যেত?

এখন পাই না, কী জানি কেন?

অতীন জিজ্ঞেস করল, কাঁটা বেগুন?

ও জাত আর হয় না মনে হয়।

অতীন বিড়বিড় করে, বিস্বাদ শব্জিতে বাজার ভর্তি।

হ্যাপি অবাক হয়ে অতীনকে দেখতে দেখতে বলল, কী দেব বল দাদা?

জালি কুমড়ো আনবে?

আনব, কাল পাবেন। বলে সে নতুন ওঠা পটল ওজন করতে লাগল। ফিকে সবুজ ছোট ছোট কচি পটল দেখে অতীনের মন ভাল হয়ে গেল। সে বাজার করতে লাগল মন দিয়ে। সিজিনের শব্জি সিজিনে খেতে ভালবাসে সে। তার ভিতরে একটা স্মৃতিময়তা লুকিয়ে থাকে। যখন চলে যেতে থাকা সিজিনের ফসল পরিত্যাগ করে, তখনই বাজারে প্রবেশ করতে থাকে নতুন ফসল তার নতুন ঘ্রাণ নিয়ে। অতীন গেল বিমলের কাছে। বিমল তার ক্লাস মেট ছিল। ক্লাস সেভেন না এইটে উঠে আর পারেনি। বড় ছেলে, রোজগারে বেরিয়েছিল। হারিয়েই গিয়েছিল। অনেকদিন পর বাজারে দেখল থানকুনি পাতা, কাঁচা হলুদ, ব্রাহ্মি শাক, গন্ধরাজ লেবু, পুদিনা পাতা, পুরনো তেঁতুল, সিজিনের চালতা কয়েত বেল নিয়ে বাজারে সেই বিমল। কোন এক কারখানায় কাজ করত। সেটি বন্ধ হওয়ার পর আর এক কারখানায়। সেটি বন্ধ হওয়ার পর কত রকম কাজই না করেছে সে। শেষে এই শব্জি নিয়ে বসা। তার ভাই কাশী ছিল জাহাজের খালাসি। এখন খিদিরপুরে থাকে। ফ্ল্যাটও হয়েছে তার। যমজ ছিল দুইজন। অদ্ভুত, একজন খালাসি হয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরে এক সিলেটি মেয়েকে বিয়ে করে এখন খিদিরপুরে দোকান করেছে ফ্যান্সি জিনিশের। সব জাহাজি মাল। অবস্থা ফিরিয়েছে, অন্যজন দিনে দিনে বুড়োই হয়েছে শুধু। এই সব গল্প বিমলের কাছেই শোনা। কাশীর চেয়ে কাশীর বউ ভাল। বিমলের বউকে এটা ওটা দেয়। বিমল থাকে ওলাইচণ্ডী বস্তিতে। আগে অতীনকে আপনি করে কথা বলত, এখন তুমিতে নেমেছে। অতীন বলল, কলমি, থানকুনি তুমি কোথায় পাও বিমল?

বিমল বলল, আগেরদিন বিকেলে দক্ষিণদাড়ির ঝিলের ধার থেকে আনি।

এখনো ঝিল আছে?

আছে, তবে শুনছি ওর পাড় বাঁধাবে, তা'লি গেল।

পাড় বাঁধালে তো চৌবাচ্চা হয়ে যাবে।

যাবে, আসলে গরমেন্টের অনেক ট্যাকা, কী করবে বুঝি উঠতি পারে না।

তখন কি থানকুনি কলমি পাবে?

না, ব্যাওসা বন্ধ হয়ে যাবে।

ইস, কেউ বারণ করছে না?

কে করবে, ঠিকেদারের বিপক্ষে কে বলতে যাবে ভাই, কাউন্সিলর কি ছেড়ে কথা বলবে, যা হবার হবে।

বিমল কাশী এদিকে আসে?

না, উরা সিলেট গেছে একমাসের জন্যি।

বাজারের ভিতরে নিঃঝুম হল অতীন বসু। সিলেট! গত সন্ধেতেই সে সিলেটি গান শুনেছে করিম শাহর। ইউ টিউব হয়ে এই সব সুবিধে হয়েছে অনেক। গোয়ালপাড়া আর সিলেটি গান, হাতি আর মাহুতের গান, মাঝি আর তার ভালবাসার কন্যের গান, ফসলের গান, নদীর গান... সব ঘরে বসে শুনতে পায় সে। শোনেও। ভিডিওগুলোয় এক ধরনের কাঁচা শব্জির গন্ধ আছে। শুনতে গিয়ে অতীন কড়া নারকেল তেলের সুবাস পায়। তাদের বসিরহাটের কাছে আমতলির বাড়িতে নারকেল শুকিয়ে তার জল মেরে ঘানি থেকে তেল করে আনা হত। সেই তেল খুব গাঢ়। একটু হলদেটে ভাব তার ভিতরে। তার গন্ধ তীব্র। সেই গন্ধ মা-কাকীর চুলের ভিতরে পাওয়া যেত। সিলেটের কথা শুনে সেই গন্ধ যেন ভেসে এল। বিমল বলল, তুমি ওই দেশ গেছ?

একবার।

কেমন দেশ?

আমি সিলেট যাইনি বিমল।

বিমল বলল, তখন আমারও জাহাজে যাবার কথা হয়েছিল, কিন্তু মা বাপরে দ্যাখবে কে, আমাদের মিষ্টির দোকান উঠে গেছে, মা-বাপের জন্যি আমি থেকে গেলাম।

ভাল করেছিলে।

হ্যাঁ, লোকে বলে পুণ্য করেচি, কিন্তু পেট চলে না, বউ সাতবাড়ি বাসন মাজে।

চুপ করে থাকল অতীন। রোববার বলে এত কথা হচ্ছে। আর বিমল কথা বলতে বলতে তার দু-পাঁচ টাকার খদ্দের বিদায় করছে। অতীন সিগারেট ধরিয়ে একপাশে কদম গাছের নিচে। বিমলের ঠিক পেছনে। বিমল বলল, সিলেট অনেকদূর তাই না?

হ্যাঁ, আমাদের কাছাড়ের কাছে।

সে কোথায়?

আসাম, সুরমা ভ্যালি বলে ওইসব জায়গাকে।

তুমি তো যাওনি?

না, কিন্তু এপারে হাইলাকান্দি, শিলচর গেছি।

অবাক লাগে, ওর ভয়-ডর নেই।

অতীন চুপ করে থাকল।

মাথা নাড়ে বিমল, কে জানে, হয় তো ওদিকিই থেকি গেল, ওর তো দোবার বিয়ে, আগেরটা খেস্টান ছেল, তিন মাস বাদে চলে গেছে, সে নাকি ওই রকমই, কোনো স্বামীতেই মন হয় না সেই জুলিয়ার।

অদ্ভুত! বিমল খুব কথা বলতে চায়। কিন্তু ওর এই সব পরম বিস্ময়ের কথা শুনবে কে? তাই অতীনকে দেখে ওর বিক্রি-বাটা বন্ধ হয়ে যায় রোববারে। অতীন বলল, বল বিমল, সেই খ্রিস্টান মেয়ে কোথাকার ছিল?

বিমল মাথা নাড়ে। জানে না। দ্যাখেও নি তাকে। শুধু ভাইয়ের কাছে শুনেছে তার কথা। সে কোন এক দ্বীপের মেয়ে। খুব ফর্শা ছিল। দুধে আলতায় রঙ। সুন্দরীও ছিল। কিন্তু থাকল না। থাকবে না জানাই ছিল নাকি কাশীর। শুধু যে ক'দিন থাকে। বহু পুরুষের সঙ্গে শুয়েছে সে। তার সঙ্গেও। শুধু সে গিরজায় গিয়ে বিয়ে করেছিল। চলে যাওয়ার পর আবার হিন্দু। এখন সিলেটে গিয়ে বাংলাদেশী না হয়ে যায়।

তাহলে?

বিমল বলল, বউমা খুব ভাল, সেই ওরে ফিরোয়ে নিয়ে আসবে।

সে তো সিলেটি।

তা হোক, বউমা আমাদের খুব ভালবাসে, তার মা-বাপ ওদেশে বলে গেল দেখতি, তুমি পাহাড় দেখেছ অতীন?

অতীন বলল, তোমার খদ্দের চলে যাবে, এখন গল্প করার সময় না।

যার দরকার সে ঠিক নিতি আসবে, থানকুনি, কাঁচা হলুদ দেবে কে আর, তুমার তো রোববার ছাড়া সময় হয় না।

তা হয় না।

পাহাড় দেখা যায় বউমার বাপের বাড়ির গাঁ থেকে, বউমা বলে ইন্ডিয়ার পাহাড়।

হ্যাঁ, মেঘালয় হিলস দেখা যায় শুনেছি।

এক দেশ থেকে আর এক দেশের পাহাড় কী করে দেখা যায়, বডার নেই অতীন?

অতীন অবাক হয়ে বিমলের দিকে তাকায়। বিমল বলছে, তার খুব ইচ্ছে একবার খুলনা ডুমুরে যায়, তাদের বাড়ি ছিল সেই গ্রামে। কিন্তু গিয়ে কী হবে, তার জন্ম যে এপারে। ওখানে কে তাকে চিনবে? কিন্তু তার এক কাকা ছিল, পিসে-পিসি ছিল ওই দেশে। সে কতকাল আগের কথা। বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় তার সতের-আঠের, তখন তারা পার হয়ে এসেছিল কিনা কে জানে? নাকি খানসেনাদের হাতে মরেছে তারা? সেই সময় তার বাবা খোঁজ করেছিল। কিন্তু সন্ধান পায়নি কোন। তখন তাদের মিষ্টির দোকান উঠে যাচ্ছে। তার বাবা বলেছিল, পাকিস্তান উঠে গেলে ফেরত যাবে আবার ডুমুরে। এদেশে এসে কী হল? ভাল করে খেতেই পেল না কেউ। এই ব্যবসা কি চলে, না এতে পেট চলতে পারে, বল তুমি?

আমাকে জিজ্ঞেস করছ?

হ্যাঁ, আমার বউ ঝিগিরি করে, আমি বিকেলে থম মেরে বসে থাকি, ছেলেডা কুথায় চলে গেছে কাজের খোঁজে, জানিনে।

তোমার মেয়ে?

জানিনে।

তার মানে?

বিমল বলল, ফুল বেচে জামাই আশুবাবুর বাজারে, থাকে হাবড়ায়, আমার সঙ্গে যোগাযোগ নেই।

বিমল বকবক করে আর কাঁচা হলুদ, থানকুনি বেচে। অতীন উঠবে ভাবে। আর না। গল্প করে করে বিমলের ব্যবসার সে ক্ষতি করছে। কিন্তু বিমল বলল, আর একটু, চা আনব।

না না, বল কী বলবে।

বিমল বলল, আমার অবাক লাগে, ওর ভয়-ডর নেই।

চমকে ওঠে অতীন, কার কথা বলছ?

আমার ভাই কাশীর। বিমল বলল।

ভয়-ডরের কী আছে? অতীন বলে।

আমার খুব ভয় যদি হারাই যাই! বিড়বিড় করে বলল, ষাট ছুঁয়ে ফেলা বিমল বিশ্বাস, যদি পথ না খুঁজি পাই ফিরার সময়।

অতীন বলল, এই বয়সে তা হয় নাকি?

হতিই বা দোষ কী বলো। বিমল উত্তর দিতে দিতে কাঁচা হলুদ আড়াইশো গ্রাম ওজন করে দিল এক মধ্যবয়সীকে। তার খদ্দের কম। উচ্ছে বেগুন পটল মুলোর খদ্দের বেশি হয়। কাঁচা হলুদ, থানকুনি পাতা, ব্রাহ্মী শাক, কলমি শাক আর বকফুলের খদ্দের তার চেনা। তারা জানে লোকটা খুব বকে। মেনে নেয়। সে আলু-পটলের কারবার করতে পারত, কিন্তু এইটাই ওর পছন্দ। পছন্দ না হলে কারবার করা যায়?

অতীন হাসল, জিজ্ঞেস করল, কবে ফিরবে কাশী?

কেডা জানে, সিলেটিরা নাকি মাঝি মাল্লা খালাসি বেশি হয় বলে? বিমল জিজ্ঞেস করে।

অতীন বলল, শুনেছি তাই, নদীর দেশের মানুষের সাহস বেশি হয় বিমল, ভেসে থাকে জলে, আমার তো জলে খুব ভয়।

গাঙে! জিজ্ঞেস করে বিমল।

গাঙ শব্দটি কতদিন বাদে শুনল অতীন, বলল, হ্যাঁ, গাঙ বলে ওদেশে।

বিমল বলে, আমিও বলি অতীনভাই, আমার ভাইডার ভিতরে গাঙের হাওয়া লেগেচে, হারাই না যায়, বলে সমুদ্দুরের মাঝে গেলি সবদিকি জল।

হ্যাঁ।

হারাই গেলি উপায় নাই।

বেশ লাগে বিমলকে। ওর মনের ভিতরে বাল্যকাল লুকিয়ে আছে। অতীন সব ফেলে এসেছে। অতীনের ফেরার উপায় নেই। বিমল পারে। প্রায় বৃদ্ধ হয়ে আসা বিমল হারিয়ে যাওয়ার ভয় পায়, আচমকা পথে দাঁড়িয়ে পড়ে কিছু দ্যাখে। একটি গাছের ছায়া দেখেও দাঁড়িয়ে পড়ে, যেন সেই ছায়া জন্মাল সেই দিন, তখন।

বিমল বলল, তুমি স্বপন বল্লভরে মনে করতি পার?

কোন অতল থেকে ডুবুরির ডুবো জাহাজের ক্যাপ্টেনের দেহ তুলে আনার মত করে একটা নাম তুলে আনল বিমল। স্বপন বল্লভ! তাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়। অস্ত্রের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে বিপ্লব করতে বাড়ি ছেড়ে আর ফেরেনি। নাকি ফিরেছিল? জনযুদ্ধে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছিল। এক ভোরে তার বাড়ি এসেছিল, অতীন আমাকে কিছু টাকা দেবে, বিপ্লবের জন্য দিচ্ছ মনে কর।

অতীন জিজ্ঞেস করল, সে ফিরেছে?

না, তার বাবা ছেলেরে খুঁজতে গিয়ে ফিরেনি, হারাই গেছে মনে হয়।

অতীন চুপ করে থাকল। কী বলবে? তখন বিমল বলে, কিন্তু তিনি যে ওরে খুঁজতি গেছেন তাও বলা যায় না, এমনিই সব ভুলি যাচ্ছিলেন তিনি, একদিন ঘর থেকে নিজি নিজি বেরুয়ে গিয়ে আর ফিরেননি। অতীন ওঠে। কত সময় বসে থাকবে উবু হয়ে। এখন উবু হতে কষ্ট হয়। কোমর ধরে যায়। সে উঠে দাঁড়ায়। বিমল বলল, এস, কাশী ফিরলে তোমার সঙ্গে দেখা করতি বলব, গাঙ আর মাঝি-মাল্লার কথা শুনো, কিন্তু সে যদি হারাই যায়।

অতীন হাসে, এতদিন তো হারায়নি, হারাবে কেন?

দ্যাখো ভাই গাঙের নেশা খুব নেশা, গাঙ তো ডেকে নিয়ে যায়।

হ্যাঁ। অতীন আর কথা বাড়ায় না। বিমলকে ছেড়ে মাছের বাজারের ভিতর ঢুকে পড়ে। ঢুকতে নেপেনবাবুর চায়ের দোকান। নেপেনবাবু অনেকদিন গত হয়েছেন। এক ছেলের হাতে দোকান। আর এক ছেলে থাকে রূপনারায়ণপুর। ভাল ফুটবল খেলে হিন্দুস্থান কেবলস-এ চাকরি পেয়েছিল। সেই ফ্যাক্টরি এখন বন্ধ। কিন্তু সে রয়ে গেছে ওখানেই। বাড়ি করেছে। বউ প্রাইমারি স্কুলের টিচার। মন্টু একটা দোকান করেছে খেলার সরঞ্জামের। আর ফুটবল কোচিং করে। কলকাতা আসে না। অতীন মাস তিন আগে গিয়েছিল রূপনারায়ণপুর গ্রামীণ সংবাদপত্রের সম্মেলনে ভাষণ দিতে। সেখানেই দেখা মন্টুর সঙ্গে। সে এসেছিল স্পোর্টস রিপোর্টার হয়ে। কবে সেই পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে ফুটবল খেলত মন্টু, এখনো তাই নিয়ে আছে। বেশ আছে।

বাজার থেকে ফেরার সময় অতীনকে ধরল আবার তেতাল্লিশের মন্বন্তর থেকে ফিরে আসা নিলু রায়, কীরে, টাকা-পয়সা দেবে তো সরকার?

কিসের টাকা?

আবে, তুই তো রিটায়ার করতে যাচ্ছিস, পাওনাগণ্ডা?

সে আমি বুঝব, তোকে ভাবতে হবে না।

বাজারে তো তাই রটেছে। নিলু তার টিঙটিঙে ঠ্যাং নাচাতে নাচাতে বলল, তোর সরকারের ভাঁড়ে মা ভবানী, বলেছে ডিউ স্লিপ দেবে, পাঁচ বছর বাদে ভাঙাতে পারবি, দ্যাখ না কী হয়।

অতীন কথা না বলে ফ্ল্যাটে ঢুকল। বিরক্তিতে মন ভরে গেছে। আজ বিমলের কথা শুনে, রূপার খবর পেয়ে যে স্নাত হয়ে সে বাড়ি ফিরছিল তা নষ্ট করে দিল নিলু রায়। কোন ব্যাপার নয়, লোককে অতিষ্ঠ করেই ওর আনন্দ। সত্য হোক মিথ্যে হোক, লোককে উদ্বিগ্ন করে দিয়েই ওর স্বস্তি। একবার, সেই ইস্কুলবেলায় নিলু ক্লাসের সুপ্রভাতকে বলেছিল, তোর বাবাকে পুলিশ তুলে নিয়ে গেছে, তোর বাবা নকশাল?

সেই গত শতকের সত্তর দশকের কথা। সুপ্রভাত বেরা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ছুটলে হে হে করে হাসছিল নীলাম্বর-নিলু রায়। সবটাই ঢপ। কতরকম মিথ্যে বলে লোককে ছুটিয়েছে ও। জিজ্ঞেস করলে বলে, ভাল লাগে, শালা কাপড় তুলে কেমন দৌড়য়।

অন্যায় এটা। কে যেন ওকে বোঝাতে গিয়েছিল।

কেন বে, কিসের অন্যায়, তুমি বুদ্ধু, কথা শুনে দৌড়বে কেন বোকাচোদা।

পাখার নিচে বসে গায়ের ঘাম শুকোতে লাগল অতীন। খবরের কাগজ এসে গেছে। কাগজ নাড়াচাড়া করতে করতে আচমকা একটি ছোট খবরে চোখ পড়ল। সুরকার অনল চট্টোপাধ্যায় চলে গেছেন গত সন্ধ্যায় কলকাতার এক নার্সিং হোমে। কতদিন বাদে নামটি মনে পড়ল। একটি গানের কথা লিখেছেন সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদক, যদি চলকে পড়ে কল্কে ফুলে মধুটি আর রয় না...চাঁপার বনে গান ধরেছে ভিনদেশী এক ময়না। উফ, কতদিনের পুরনো গান। প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। হারিয়েই গিয়েছে এই সব গান, ভুলেই গেছে সবাই এইসব গান। ভুলবে না কেন, রেডিও নেই, অনুরোধের আসর নেই। এফ এম রেডিও কলকাতার বাইরে গিয়ে বোবা।

অতীন ডাকল শম্পাকে, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গানটা আছে?

শম্পা আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এল, কী গান?

অতীন গুনগুন করে উঠতেই শম্পা বলল, থাকতে পারে, খুঁজে দ্যাখো সিডির ভিতরে, আছে তো কম না।

আর সেই বাঁশবাগানের মাথার উপর... বলতে বলতে আচমকা তার মনে পড়ে গেল মায়ের কথা। মায়ের ছবির দিকে তাকিয়ে বাবার কথা। সেখান থেকে এক গান, আহা কী সুন্দর মনে পড়ে গেল, নদীটি গিয়াছে চলিয়া... নদী চলে গিয়ে পথ শূন্য করে দিয়ে গেছে। অদ্ভুত! কি গান এইটা। কে গেয়েছিল? মনে পড়তে লাগল। শম্পা এই গান তুমি কোনদিন শুনেছ? নদীটি গিয়াছে চলিয়া...।

• পরবর্তী সংখ্যায়

অমর মিত্র
সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয় লেখক

Coca-Cola
খোলো খুশির জোয়ার!

ছোটগল্প

কোথাও কোথাও কান্না তৈরি হচ্ছে

হামিদ রায়হান

আমাদের চোখের দৃষ্টিতে তখনও ঘষা কাচের মত অর্থহীন সন্ধিক্ষণের নৃত্য ভিড় জমাচ্ছে, যে মুহূর্তে জানানো হল, স্যার আসছেন না। ডিপার্টমেন্টের অফিস এক্‌জিকিউটিভ আলি ভাই জানায়, বিশেষ কারণে হামিদুর রহমান স্যার আজকে ক্লাস নিচ্ছেন না; পরে, মেক-আপ ক্লাসের সময় জানিয়ে দেবে। নোটিশ শেষ না হতে চোখ বুজে আমরা সোজা রাস্তায়। হন্তদন্ত হয়ে।

তখন সবে বিকেল ৪:৩০। শীত শীত লাগছে। ধানমন্ডি ৩ নম্বর সড়ক ধরে হাঁটছি। মাহাথির ও আমরা। সন্ধ্যা এখনও জাঁকিয়ে বসেনি। তবে এর মধ্যে রাস্তার বাতিগুলো জ্বলতে শুরু করেছে। সেই আবছা আলোয় রাস্তার ওপারে রহস্যময় হাসিমুখে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যখন মেইন রাস্তায় চলে আসি আমরা, তখন কোন ভূমিকা ছাড়াই মাহাথির বলে– ওই, তোরা কই, আমি কোন কিছু দেকতাচি না, সব কিছু আন্ধার লাগাতাচে।

নাদুস নুদুস তুলতুলে সুন্দর বাচ্চা মেয়ে দেখলে যেমন আদর করতে ইচ্ছে করে, সুযোগ বুঝে গাল টিপে দিতে আঙুলগুলো উসখুশ করতে থাকে, মেয়েটিকে একটু অন্যরকমভাবে কাছে পেতে ইচ্ছেগুলো ডানা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। ক্রমশ আমার চোখ দুটো গেঁথে যাচ্ছে সেই দিকে।

ভুরুজোড়া কপালে তুলে মৃদুমন্দ কণ্ঠে বলে জাহাঙ্গির– তার মানে?

জাহাঙ্গির আমার ডানদিকে। তার দিকে মুখ না ঘুরিয়েই কটু কণ্ঠে বলছি, 'রাখ পণ্ডিত, তর মানে মানে। হে ভাব ধরচে, কোন কিছু বুঝচ?'

আমার কথাগুলো ঝাপসা করে দিয়ে আবারও মাহাথিরের কণ্ঠ, 'কিছু দেখচি না রে, সব কেমন আন্ধা আন্ধা লাগচে?

মেকি আচরণ জাহাঙ্গিরের একদম অপছন্দ। এসব একদম অসহ্য। সে যা বলে, স্পষ্ট করে বলে। মাহাথিরের কথায় ও চোখ বড় করে তাকায়, বলে, ভাব ধরিচ না, তোমার মতলব কি চান্দু? লাবণ্য লগে নাই, থাকলে তোমার কেমন কেমন ভাবটা কেটে যেত।

আমার চোখ দুটো তখনও রাস্তার ওপারে মেয়েটির দিকে।

মাহাথির আমার থেকে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা। তার কাঁধ ঘেঁষে কান বরাবর মুখ এনে বলে জাহাঙ্গির– আন্ধা বাবা, আপনের মধ্যি কি ভাব আইচে, আমাগো খুলে কন।

বলে থামে জাহাঙ্গির। আমাকে ভাল করে দেখে নেয়। নিজের কথার সমর্থনে ফের বলে, 'কি কচ রায়হান, জানতে পারলে ভাল হয়; আন্ধা বাবের তাইলে কোন ব্যবস্থা টেবস্থা করন যায় কি না, ভাবা যাবে, ঠিক না?

রাত তখনও ঝাঁপিয়ে বসেনি, রাস্তার বাতিগুলোর জ্বলে-ওঠা আভিজাত্য তাকে স্বাগত জানাচ্ছে, নিঃশব্দে ঠাওর করা যাচ্ছে। রাতের আলো-আঁধারে প্রস্ফুট রাস্তার বাতিগুলোর গাম্ভীর্য মেয়েটিকে মোহনীয় করে তুলেছে। নাদুস নুদুস তুলতুলে সুন্দর বাচ্চা মেয়ে দেখলে যেমন আদর করতে ইচ্ছে করে, সুযোগ বুঝে গাল টিপে দিতে আঙুলগুলো উসখুশ করতে থাকে, মেয়েটিকে একটু অন্যরকমভাবে কাছে পেতে ইচ্ছেগুলো ডানা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। ক্রমশ আমার চোখ দুটো গেঁথে যাচ্ছে সেই দিকে। মেয়েটির সঙ্গে আমার একের পর এক দৃশ্য বদলে যাচ্ছে। এত সুন্দর! মেয়েটির সঙ্গে আমি একাকার হয়ে যাচ্ছি।

আমি যখন এক অভূতপূর্ব কল্পনার অতলান্তিকে, তখন জাহাঙ্গির বলে, 'দেখ, দেখ রায়হান, রাস্তার ওপারে একটি মেয়ে। অসাধারণ! অপূর্ব! তাই না!'

মনে মনে হাসি। চোরা হাসি। প্রসঙ্গটির পাশ ফেরাই। বোধ হয়, মেয়েটির সৌন্দর্যের আগুনে কোন কিছু দেখছে না। সেরকম পরিস্থিতিতে অন্য কিছু দেখা কিংবা মনে আসা অস্বাভাবিক এবং এরকম কোন ঘটনা না-ঘটে থাকলে তা হবে অনেকটা বালকসুলভ। প্রেমে পড়লে বুদ্ধিমানও অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকে। আমার ঠোঁটের ওপর বাঁকা হাসি প্রকাশিত হয়।

আমার চোখজোড়াও মেয়েটিকে নিয়ে ভ্রমণ করছে। একা, একা। এমত চিন্তায় যখন ডুবে যাচ্ছি, সেই মুহূর্তে জাহাঙ্গিরের কথা সব চুরমার করে। এ যে নেহাত ভুল। এদিকে জাহাঙ্গির মেয়েটিকে নিয়ে নিভৃতে খেলছে। নিজের মত করে, খেলারাম খেলে যা স্টাইলে। বাহ, কি সেলুকাস! নিজের দুর্বলতা আড়ালে নিয়ে বলি, 'এই অন্ধ ভাল হওনের উপায়?'

'আমার জানা মতে, একটি উপায় আছে।' জাহাঙ্গিরের জবাব, কণ্ঠ গাঢ়, তীব্র।

'কি?' আমার জিজ্ঞাসা, কৌতূহলী ভঙ্গি।

'যদি মেয়েটি একটু মৃদু হাত বুলায়, তাহলে এই অন্ধ ভাল হবে! না হলে এই অন্ধ ভাল...

'না হলে?'

'না হলে আবার?'

জাহাঙ্গির বলে, না, 'এ নিয়ে কোন কথা নয়', বাসায় চলে যেতে, সামনে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, 'তবে এখন আমি যাই। কথা হবে, পরে।'

মাহাথিরের সঙ্গে জাহাঙ্গিরের চোখাচোখি হয়। কোন কথা বলে না, কেবল দৃষ্টি বিনিময় হয়। এরপর যেই সে পা বাড়াতে যায়, মুহূর্তে, মাহাথির ঘোরে জাহাঙ্গিরের দিকে, তার শার্টের কলার চেপে বলে, 'চুপে সৌন্দর্যসুধা পান করলেন আকণ্ঠ। এদিকে আমাগো একা রেখে কোথায় যান?'

'রায়হান, এই অন্ধ, সব দেখে। এ কেমন অন্ধ রে বাবা!' জাহাঙ্গিরের বিস্ময়, নিচু স্বর।

'মডার্ন অন্ধ, সব দেখে, এটা জানেন না? তয় সকল সময় না।'

একটি ছোট দীর্ঘশ্বাস ঝরে জাহাঙ্গিরের কণ্ঠ থেকে; কাতর স্বরে বলে, 'কিছু বুঝতেছি না।'

জাহাঙ্গিরের চোখে চোখ রাখি। এক পলক। কিন্তু এ হেতু, একটি শব্দও খরচ করতে হয় না। ইতোমধ্যে, আমরা চলে এসেছি প্রায় মেয়েটির কাছে অনেকটা। অকস্মাৎ, মাহাথির তার হাত উঁচিয়ে থামতে ইঙ্গিত করে অনুরোধ করে, 'ওরে! তোরা কিছুক্ষণ থাম। মনে হচ্ছে, মেয়েটিকে আমি চিনি।'

আমার মত জাহাঙ্গির ভুরু কুঁচকে সাহস করে বলে, 'কি বলছিস? জেনে শুনে বলছিস তো? ঠিক আছিস, না... !'

'আরে, বিশ্বাস কর আমাকে; এই মেয়েটিকে আমি আজ সকালে আমাদের বাসার সামনে দেখেছি, দরজায় নক করছে। সঙ্গে একটি অন্ধ ছিল। দরজা খুলতে, মেয়েটি ভিক্ষা চায়। সেই সময় আমি বাসা থেকে বের হয়ে আসতেছিলাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে।'

জাহাঙ্গির মুচকি হাসে, আমার দিকে মিটিমিটি তাকিয়ে হেসে বলে, 'এবার বুঝছিস, আমার কিছু বলার নাই, সত্যি, সে অন্ধ হয়ে গেছে। ওকে ডাক্তার দেখাতে হবে।'

মাহাথির তার কপাল ভাঁজ করে, বলে, 'তোরা বুঝছিস না ঘটনাটা?'

জাহাঙ্গিরের জবাব, 'না বোঝার কি আছে? যা বলবে, আমরা বিশ্বাস করব; তবে, এটা অন্তত আমাদের বিশ্বাস করতে বোলো না। এই মেয়েটিকে দেখতে লাগছে সেই মেয়েটি মত, যে সকালবেলা এসেছিল ভিক্ষা করতে; তাই তুমি বলতে চাও তো? সঙ সাজ, ভাল; এই অভিনয় ছেড়ে দাও, বুঝলে? এখন, তোমার ভাল হওয়ার একটা উপায় আছে, এটা হল গিয়ে গণধোলাই।'

মাহাথির নিজের মধ্যে উত্তেজনা অনুভব করে, এবং ঝাঁঝালো গলায় বলে, 'ধুৎ ছাই, তোরা কেন বুঝতে চাচ্ছিস না। অন্তত এখন আমি ফাজলামো করছি না। আমি সকালে যা দেখেছি, সেটা ভুল হতে পারে না। আমার অবাক লাগছে ভেবে। সকালবেলার মেয়েটির সঙ্গে এই মেয়েটিকে কোনভাবে মেলাতে পারছি না। সেই মেয়েটি এবং এই মেয়েটির সঙ্গে একটিমাত্র পার্থক্য আমি দেখছি, তা হল?'

'কি?'

'পোশাক,' সে বলল। তার বলার সময়, তার ভেতর থেকে একটি নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

সে শ্বাস নিল। তারপর বলল, 'জানিস, খোদার কসম, এ ছাড়া, অন্য কোন অমিল, আমি দেখছি না। আমাকে তোরা বিশ্বাস কর কিংবা না কর,

মাহাথিরের মন বেদনাত্মক নাটকের দৃশ্য হয়ে উঠছে। খিটখিটে, কর্কশ। এখন ওর কি করা উচিত, কি অনুচিত, এসবের কোন কিছু এখন তার মাথার ভেতর যাচ্ছে না। একটা কিছু করা যে দরকার সেটা সে উপলব্ধি করে; কিন্তু যে অবস্থার মধ্যে এখন আছে, সেই অবস্থা অনেকটা ঠিক যেন গণিত বইয়ের সেই বানরের বাঁশের উপরে ওঠার মত।

সত্যি বলছি, সকালে যে মেয়েটিকে আমি দেখেছি, এই মেয়েটির সঙ্গে সেই মেয়েটির আমি বিন্দুমাত্র পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছি না। কসম, আমি বলছি, এ-ই মেয়েটি হল সেই মেয়েটি।'

মাহাথিরের কথা থেকে প্রচণ্ড আকুলতা ঝরে পড়ছিল, আমরা যেন তার কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করি; সেই কারণে, এভাবে সে বাতাসে তার হাত-পা ছুঁড়ছিল। তার অঙ্গ-ভঙ্গির মধ্য দিয়ে এই রকম আকুলতা মূর্ত হয়। জাহাঙ্গিরের জিজ্ঞাসা, 'বুঝেছ, রায়হান, ওর কথা সত্য হলেও হতে পারে। কিন্তু জানিস?'

'কি?'

'তুই লক্ষ্য করেছিস, সে প্রমিত বাংলা বলছে।'

'দরকার নেই তোর কথা টেনে লম্বা করা।' বলল জাহাঙ্গির, 'ঠিক আছে। আমাদের অবিশ্বাস নেই তোর কথাতে। যখন বলছিস, আমরা দ্বিমত করছি না, আমরা তোর কথা বিশ্বাস করছি। এখন, আমি বাসায় যাচ্ছি; বাসায় একজন গেস্ট আসার কথা রয়েছে; দেখতে না পেলে, তিনি চলে যাবেন, খুব আর্জেন্ট; তোরা বুঝবি না।'

'বুঝব না মানে? বল, তুই বলতে চাস?' বলল মাহাথির, বাঁকা কণ্ঠে।

বর্তমানে জাহাঙ্গিরের খুব হাত টানাটানি যাচ্ছে। রাজশাহীর একটি কলেজ থেকে সে বিএ গ্রাজুয়েশন করেছে এবং এমএ ডিগ্রি করেছে ইংরেজিতে। এখন ইংলিশ টিচিং শিক্ষার উপর এমএ করছে। পাশাপাশি, চাকরি খুঁজছে। টিউশনি করে এবং বাড়ি থেকে পাঠানো কিছু অর্থ প্লাস-মাইনাস করে, সময়গুলো কোনক্রমে চালিয়ে নিচ্ছে।

জাহাঙ্গিরকে বিদায় দিয়ে, মাহাথির ও আমি রাস্তায় নেমে আসি। রাত্রি বাড়ছে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পল্লা দিয়ে। ক্রমে ধীরে ধীরে মায়াবী ও অস্পষ্টতার জাল বিস্তৃত হয় চারদিকে। বাড়ে নীরব কোলাহল। সেই নিঃসীম চিরাচরিত অবচেতন স্রোতের দিকে, আমরা দু'জন মানুষ হাঁটি; এবং পথ হাঁটতে হাঁটতে, অন্ধকার এবং আমরা সমার্থক হই একে অন্যের।

দুই.

মাহাথিরের মন বেদনাত্মক নাটকের দৃশ্য হয়ে উঠছে। খিটখিটে, কর্কশ। এখন ওর কি করা উচিত, কি অনুচিত, এসবের কোন কিছু এখন তার মাথার ভেতর যাচ্ছে না। একটা কিছু করা যে দরকার সেটা সে উপলব্ধি করে; কিন্তু যে অবস্থার মধ্যে এখন আছে, সেই অবস্থা অনেকটা ঠিক যেন গণিত বইয়ের সেই বানরের বাঁশের উপরে ওঠার মত। সুযোগগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে তার হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে। ধরতে চেষ্টা করছে, ধরতে পাচ্ছে না। আস্তে ধীরে, ওর চিন্তার মধ্যে ঠাণ্ডা খুন ছড়িয়ে পড়ছে; প্রস্ফুট সম্ভাবনাগুলো মূর্ত হয়, ঠিক যেন রক্তজবা ঠোঁট।

আগে বলা ছিল। আমি এলে মাহাথির বলে, 'বন্ধু, বস। বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে আসছি।' বাথরুমে গিয়ে চোখ-মুখে পানির ঝাঁপটা দেয়। ফিরে এসে কোন রকম সুযোগ না দিয়ে বলে,'চল, যাই।'

মাহাথির একটা মিনি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে ইন্টারভ্যু দিতে আসে। আমি তার সঙ্গে। মানুষে গিজগিজ ইন্টারভ্যু রুম; ঠিক যেন মাছের পোনা। পাঁচজন লোক নেবে, লেখা ছিল বিজ্ঞপ্তির মধ্যে। বায়োডাটা নিয়ে, সবাইকে উপস্থিত হতে বলে একই তারিখে।

মাহাথির হতভম্ব, অবাক হয়ে দেখছে, মানুষে কিলবিল। রুমে ঢুকে এদিক-ওদিক চারদিকে তাকায় হরিণশাবকের মত, যেন একটি আশ্চর্য বস্তু দেখছে। ঘুরে-ফিরে সবাইকে দেখে নিঃশব্দে অবাক দৃষ্টিতে। একটি শব্দও বেরোয় না তার মুখ থেকে। কোন শব্দ না করে, আমরা যখন রাস্তার উপর চলে এলাম, মৃদু করুণ কণ্ঠে আমার জিজ্ঞাসা, 'খারাপ লাগছে?'

আমার কথা শুনে, বাঁকা চোখে তাকায়; কী ভাবে, সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নেয়। এরপর, মাথা নাড়ায় কিন্তু একটি শব্দও উচ্চারণ করে না। নীরবে, আমার দিকে চেয়ে থাকে।

বেশ তীব্রতায় দিনটা চেপে বসছে চারদিকে, ঠিক যেন শব পোড়ানো চুল্লি। আমার প্রশ্ন, 'আজ গরম, তাই না?'

মাহাথির চুপ আনমনে। কপালের উপর কয়েকটা ভাঁজ সূর্যের আলোয় বেশ স্পষ্ট বৃদ্ধার শিরার মত ফুটে উঠেছে। কিছুক্ষণ পর ওর উত্তর, 'ও কিছু না।'

তার কথা থেকে শ্লেষ ঝরছে; আমার বুকের উপর বেঁধে তীক্ষ্ণ তীরের ফলার মত।

একটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড মাহাথিরের বুকের ভেতরে জ্বলছে অতি তীব্রতায়, আমার চোখ এড়ায় না। কি করব? আমার চিন্তার মধ্যে কুয়াশা ঘনীভূত হতে থাকে। সব কিছু ঝাপসা ঝাপসা হয়ে আসছে। সবকিছু আমার মুঠোর বাইরে। তবু হাতড়ে যাই, কেবল হাতের মুঠোজুড়ে অন্ধকার উঠে আসে। আলগোছে আমি চুপ মেরে যাই। কিন্তু আমাদের অসহায়বোধ সংক্রামিত করে। কী করা এখন, ভেবে পাই না। কিছু করার নেই। এ কথা মনে করলে অবসন্নতা নামে শরীরজুড়ে। বরফ ঠাণ্ডার তীব্রতা ছড়াচ্ছে সারা উপলব্ধির মধ্যে। ধু ধু শূন্যতা অনুভব করি আমার নিজের মধ্যে; ইচ্ছে করে খুব কান্না করি। নিজের ভেতরে কান্না চেপে রাখার মত কষ্ট পৃথিবীতে আর কিছু নেই।

চারিদিকে তাকালাম, অসংখ্য চোখ যেন বড় বড় করে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। 'আমাদের গিলে ফেলবে না তো?' এ কথা আমি বললে, মাহাথির মৃদু ধমক দিল আমাকে।' মুখ বাঁকা করে বলে, 'মজার জায়গা পাও না, মানুষ তাকাচ্ছে।' মানুষ তাকাচ্ছে, তা আবার আমাদের দিকে! এক দু'জন না, অনেক মানুষ; আজগুবি ভাবনা। আমি আমার কথাকে লম্বা করি না। আর, আমার সাহসও হয় না। আমি নীরব থাকাকে শ্রেয় মনে করি। কেউ প্রতিশ্রুতি দিয়ে যদি প্রতিশ্রুতি না রাখে, মাহাথিরের স্বর সপ্তমে ওঠে। বিশ্রীভাবে গালাগালি করে। তাতে কারো মন খারাপ করে কিংবা করে না– তা নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবিত হয় না। কোন মুহূর্তে কী কথা বলছে, তা তাকে ভাবতে দেখা যায় না। আর তার মন খারাপ হলে, কোন কথা নেই, লেখার অযোগ্য, কথা যা বেরোয় ওর মুখ থেকে, বিরামহীনভাবে। তাতে, কোন হেতু লাগে না। অশ্লীল কথার কারণে, জাহাঙ্গির মাহাথিরের সঙ্গে মেপে কথা বলে। তবু, অশ্লীল কথা বেরিয়ে যায় তার মুখ থেকে, অনর্গল। তাই জাহাঙ্গির সবসময় সতর্ক থাকে। যথাসম্ভব, না-শোনার ভান করে, এবং প্রসঙ্গ এড়ায়। ঠিক যেন কখনো এইসব শোনেনি; কিংবা যা শুনেছে, ও তেমন কিছু না, অতি নস্যি ব্যাপার। তাই, সে সবসময় সযত্নে এড়ায়, এই সব বিষয়।

রাস্তার এক পাশে একটি চায়ের দোকান। মাহাথির বলে, 'চল, চা খাই।'

ক্ষুধার কারণে, পেটে টান পড়েছে। কোন প্রশ্ন করা হয় না। বিনা বাক্যে অনুসরণ করতে করতে আমার প্রশ্ন, 'চারদিকে গরম বেশ, তাই না?'

মাহাথির কোন কিছু বলে না, চোখ বড় করে তাকায় আমার দিকে। হয়তো কিছু বলবে বলে মনে হয়; কিন্তু কে জানে, কি হল, কিছু বলল না;

একটি রিং পরানো হয়েছে বানরের গলায়। শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া। দড়ির এক প্রান্ত ধরা রয়েছে লোকটির হাতের মুঠোর মধ্যে। লোকটি যা আদেশ করছে বানরটি তাই তাই করে। কখনও বানরটি হাসে, কখনও কাঁদে। কখনও লাফায়, কখনও ডিগবাজি। বানরের খেলা দেখতে দেখতে জড়ো হওয়া মানুষগুলো আনন্দিত পুলকিতবোধ করে।

স্তব্ধ হয়ে তাকাল আমার দিকে, স্থির দৃষ্টি।

আমিও চুপ। আমি কথা বাড়ালাম না; নিঃশব্দে তার সঙ্গে পথ চলতে থাকি।

চলমান চা স্টল। অবশিষ্ট দুটো কলা ঝুলছিল হুকে। ছিঁড়ে নেয় দুটো কলা। খুব ক্ষুধার্ত থাকার কারণে, কোনদিকে তাকায় না, ছটফট কলা ছিলে খেতে শুরু করে, আরেক হাতে অন্যটি এগিয়ে দেয় আমার দিকে। কলার সঙ্গে একটি পাউরুটি, সাত টাকা মূল্যের। বাকল তুলে আমি কলা খেতে যাব, তখনই মাহাথির বলে, 'বুঝছ, রায়হান! নিয়তি, নিয়তি?'

ওর ফর্শা মুখ অন্ধকার হয় থোকা থোকা ঝুলে পড়া কালো জামের মত। যে কলা খাচ্ছিল কয়েক হাত দূরে নিক্ষেপ করে চা-স্টলসংলগ্ন রাস্তার উপর। নিরাশ কণ্ঠে বলে, 'তোরটাও ফেলে দে।'

তার কথা শোনার পর নিজের কলা পরখ করি, আমারটাও একই রকম, ভেতরে পচা, ওপর ফর্শা সতেজ। মাহাথিরের চোখে নিজের চোখ রেখে দৃষ্টি বিনিময় করতে করতে প্রতীকি ভাষায় বোঝালাম, 'ও ম্যান, কুল। ও কিছু নয়।'

এরও পর ওর ঠোঁটজোড়া নড়তে থাকলে, ভয়ংকর কোন কিছু ঘটার আলামত বুঝতে পেরে, ওকে কিছু বলার সুযোগ না-দিয়ে স্টলে বসা ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করি, পিচ্চি, তোর নাম কি যেন?

'কিছু জিগাইলেন আমারে, মামা?' ছেলেটির প্রশ্ন।

'তোর নাম?'

'মুহাম্মদ তাহের মিয়া।'

মাহাথির চুপচাপ। বেশ বিষণ্ন দেখায়। এক ফাঁকে আমার দিকে তাকিয়েছিল। ওকে দেখে বেশ মায়া মায়া লাগছিল। ওর দিকে চোখ যেতে ও অন্যদিকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। 'কিরে চা দিবি?' তাহের মিয়াকে তাড়া দিয়ে বলি।

'হ, মামা। এই দিতাচি।'

পলকে চা রেডি। চায়ের গ্লাস এগিয়ে দিতে দিতে বলে, 'মামা, চা ঠিক আছে?'

চায়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে, আমি মাহাথিরের দিকে তাকালে, দেখি, চায়ের মধ্যে চুমুক দিয়েছে। চুমুক দিয়ে, মাথা নাড়াল, এর অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার। চা ওর মনমত হয়েছে। চা সঠিক না হলে, এতক্ষণে তাহের মিয়াকে বিধ্বস্ত করে তুলত মাহাথিরের নোংরা ভাষা।

একটা শান্তির নিঃশ্বাস বেরোয় আমার বুকের ভেতর থেকে। এই যাত্রায়, তাহের মিয়া তার বিপদ অতিক্রম করে। একটা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি থেকে সে উদ্ধার পায়। আল্লাহ, তোমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতা। অবচেতন মনে হয়তো রাগে অন্ধ হয়ে কয়েকটা চড় দেওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় ওর পক্ষে। কলা পচা। তাতে কিছু বলেনি। তাই বলে চায়েও গলদ। এটাও কেন মেনে নেবে?

কিন্তু দুটো কলা দেখাচ্ছিল দৃষ্টিনন্দন, মনোরম। ঠিক অনেকটা সুপার মলের ভেতরের পুতুলের মত। এক কথায়, অপূর্ব! প্রথম দর্শনে যে কারো ইচ্ছে হবে খেতে। বাকল ছিলতে বেরিয়ে আসে, বিশ্রী পচা গন্ধ! অখাদ্য!

এক্ষুনি সবকিছু বের হয়ে আসতে চাইছে পেট থেকে। ছোপ ছোপ রক্ত, নাড়ি, কফ। একে একে, সব।

আমরা যখন রাস্তার উপর এসে দাঁড়ালাম, ঘড়ির দিকে চোখ পড়ে, এখনও ৪টা বাজেনি, আমাদের মধ্যে এক ধরনের আশ্বস্তবোধ অনুভূত হয়। তবে, ঘড়ির কাঁটা ৩:৩০ পার হয়ে ৩:৩৮ মিনিটের কাঁটা স্পর্শ করেছে।

হাঁটতে হাঁটতে, জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যাচ্ছি?'

মুখটা বাঁকিয়ে উল্টো প্রশ্ন ছোঁড়ে, 'ভুলে গেছস? তোরে বলেছি, এক বড় ভাইয়ের কাছে যাব। আমাদের এলাকার।'

'ও, তাই তো!' মাথা নাড়ালাম। নতভাবে। ঠিক যেন একজন দুঃখী, অভাবী মানুষ।

আমার দিকে তাকায় না, উদাসভাবে বলে আবার, 'জাতীয় মানবতাবাদী পার্টি করেন; এবার ওই পার্টি থেকে এমপি নির্বাচিত হইচে, তার কাছে যাইতাচি।'

'তয় ওইখানে গেলি কেন?'

'দেখতে?' বলে মাহাথির। বলে, নীরব হয়ে পড়ে। ওর মুখ থেকে কোন শব্দ উচ্চারিত হয় না। কিছু বলবে, সেই লক্ষণ চোখে পড়ে না। ভেতরটা কেন যেন কেঁপে ওঠে। প্রচণ্ড নাড়া দেয়। কোন অশুভ কিছু ঘটতে যাচ্ছে না তো, রক্তের ভেতর চিমটি কাটে; কী ভেবে ওর দিকে চোখ যেতে, আকস্মিকভাবে আমার ভেতর থেকে আকস্মিক বেরিয়ে পড়ে, 'ও, তাই...!'

এমনভাবে আমি উচ্চারণ করি যেন মহাপ্রলয় আমাদের খুব সন্নিকটে। কিংবা এরকম প্রলয়ংকর কিছু হয়ে গেছে। এছাড়া কোন শব্দ মুখের ওপর উঠে আসে না। শুধু আড়দৃষ্টি নিয়ে, আমি তাকিয়ে থাকি তার দিকে। এ অবস্থায় কি বলা যেতে পারে, কিংবা কি ধরনের বাক্য ব্যবহার করা যায়, তা প্রাসঙ্গিক কি অপ্রাসঙ্গিক, ভাবনার ফুসরত নেই। এই সময়ে, নীরব থাকাকে উত্তম মনে হয়। বুদ্ধিমান মানুষ সবসময় নীবর থাকতে পছন্দ করে। আমিও তাই করি।

মাহাথিরই নীরবতা ভেঙে বলে, 'বুঝছিস?'

তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলি, 'কি?'

একবিন্দুও তাকাল না আমার দিকে, বলে, উদাস কণ্ঠে, 'যেভাবে পারছে, মানুষ খেলে যায়, মানুষ নিয়ে।'

বলে থামে। একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়ে। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। তবে বলে না কোনকিছু। আবারও একটা ছোট ভারী নিঃশ্বাস ছাড়ে, চোখ এড়ায় না; এই প্রসঙ্গে, কথা বলা সত্যি অবান্তর, তবে আমার মর্মমূল স্পর্শ করে, ক্ষতের উপর লবণ ঢেলে দেওয়ার মত। কেবল ওর মুখের দিকে আমি দৃষ্টি স্থির করি, ভাবলেশহীন, মূক। পরিস্থিতি প্রতীয়মান হয় তার কাছে বিধ্বস্ত, হতাশাগ্রস্ত মানুষের মত, দাঁড়িয়ে থাকা, দূরে অস্পষ্ট; তবে, সে বলল স্পষ্ট স্বরে, 'এখনও, আমরা গিনিপিগ, মুষ্টিমেয় মানুষের কাছে।'

আমার জিজ্ঞাসা, 'কিছু বললি।'

ওর জবাব, 'না, ওসব কিছু না।' উদাসভাবে, নির্দেশ করে, আঙুল দিয়ে।

মুহূর্তের মধ্যে, আমার দৃষ্টি আটকে গেলে দেখি, আমাদের থেকে কিছু দূরে অনেকগুলো মানুষ ঘিরে আছে একজন মানুষকে। সেই লোকটি তাদের বানর খেলা দেখায়। একটি রিং পরানো হয়েছে বানরের গলায়। শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া। দড়ির এক প্রান্ত ধরা রয়েছে লোকটির হাতের মুঠোর মধ্যে। লোকটি যা আদেশ করছে বানরটি তাই তাই করে। কখনও বানরটি হাসে, কখনও কাঁদে। কখনও লাফায়, কখনও ডিগবাজি। বানরের খেলা দেখতে দেখতে জড়ো হওয়া মানুষগুলো আনন্দিত, পুলকিত

বোধ করে।

হঠাৎ একটি প্রবাহ তরঙ্গায়িত হতে থাকে তার চিন্তার উপর। এই প্রবাহ হেতু, অসংখ্য দ্বন্দ্ব একীভূত হয় তার চিন্তাপ্রবাহ জুড়ে; এ কারণে, ক্রমশ এই উপলব্ধি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার চিন্তার প্রদেশময়: 'বানর ও আমরা' কিংবা 'আমরা ও বানর' সমার্থক শব্দ; যখন এই চিন্তা প্রবলভাবে প্রবাহিত হয়, তখনই একটা বরফশীতল হিম সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে, সে তাকাতে লাগল চারদিকে, একজন অপমানিত ও অপদস্থ মানুষ হয়ে।

তাকে দেখা যাচ্ছে তার মাথা নাড়তে, এটা অনুভূত হয় আমার মধ্যে, ও ফুঁসে উঠেছে, অবচেতনভাবে। ওর ফুঁসে-ওঠা নীরবে বলছে, এখনই হয়তো ভয়ানক কিছু ঘটে যাবে। আমার মনের মধ্যে এ বোধ জেগে উঠলে, ভেতরে ভেতরে আমি কুঁকড়ে যেতে থাকি। অগত্যা, নিঃশব্দে আমি তাকে অনুসরণ করতে থাকি। কয়েক মিনিট হাঁটার পর, রাস্তার বাঁ পাশ থেকে ডানদিকে সংলগ্ন একটি হোটেলকে ও আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে বলে, 'এখানেই এখন তাকে পাওয়া যাবে। চল যাই।'

এরপর আর কোন কথোপকথন হয় না আমাদের মধ্যে। রাস্তা পার হয়ে আমরা এগোই হোটেলের দিকে। তাকে বাধা দেয় না হোটেলের মধ্যে প্রবেশ করতে। দ্রুতবেগে উঠে পড়ে তৃতীয়তলার উপর। মনে হয়, এখানে সে বেশ পরিচিত। তাকে সবাই চেনে। আমিও ওকে অনুসরণ করতে থাকি অন্ধ মানুষের মত। ওর পিছু পিছু। দ্বিতীয়তলার উপর আমরা যখন উঠে আসি, তখন বলে, উপরের দিকে পা ফেলতে ফেলতে, 'মনটা বেশ ফুরফুরে লাগছে, ঠিক বলগা হরিণ।'

'মানে?'

'তুই কি বুঝেছিস?'

'না, বুঝিনি।'

'এখন আমার নাচতে ইচ্ছে করছে, যেভাবে ম্যাডোনা নাচে। কোন কাপড়-চোপড় থাকবে না শরীরে। স্রেফ জন্মদিনের পোশাক থাকবে শরীরে।'

'মন্দ হবে না। পরে দেখতে পারিস।'

ও শব্দহীন। আমার দিকে তাকায় অদ্ভুতভাবে।

তাকে চুপ থাকতে দেখে আমি প্রশ্ন করি আবার, শান্তভাবে, 'এইরকম উদ্ভট পোশাক পরিধানের কারণ কি? এটা আমার কাছে পরিষ্কার না। ম্যাডোনা ওভাবে নাচে? আর তুই যদি ওইরকম কিছু পরিস, ভাল দেখাবে?'

'তাতে আমাকে ভাল, না বিশ্রি দেখাবে... এটা বিবেচ্য নয়, মূল উদ্দেশ্য হল আনন্দ।'

'জানিস?' আমার জিজ্ঞাসা, এর হেতু মাহাথির ভাল মেজাজে রয়েছে।

'কি?'

'জন্মদিনের পোশাকে সব মানুষকে সুন্দর দেখায় না, কেবল শিশু ছাড়া।'

অন্য সময় হলে হয়তো এতক্ষণে বাজে ভাষা একটানা গুলিবৃষ্টির মত পড়তে থাকত আমার উপর; কিন্তু না, তা করে না। মুখের উপর এক ঝিলিক হাসি টেনে, আমার দিকে তাকায়, কিছু বলে না, আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে পর মুহূর্তে অন্যদিকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। এরপর, উঠে যেতে থাকে সোজা উপরের দিকে। নীরবে হাঁটতে থাকি ওর পিছু পিছু।

উপর তলার দিকে উঠতে উঠতে, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, 'খুব ইয়াম্মি মেজাজে আছিস মনে হচ্ছে।'

'হ।' জবাব দেয় মাথা হালকাভাবে নাড়াতে নাড়াতে।

'কারণ কি?'

'সোনার হরিণ।'

'চাকরি তো?'

মাহাথির তার মাথা নাড়ায়। আমার প্রশ্ন, সন্দেহ স্বরে, 'দেবে তো? না, তোর চোখের সামনে চাকরির কলা ঝুলিয়ে রাখবেন, আর এর পেছনে পেছনে দৌড়াবি?'

এর জবাবে নিশ্চুপ থাকে। একবার আমার চোখের দিকে তাকায়, এবং পরে, তাকায় দূরে, কোথাও, ঠিক একজন উদাসীন মানুষের মত। যেন খুঁড়ছে স্তব্ধতার নির্জনতা।

এই অবস্থা হেতু, কোনকিছু আমার জিজ্ঞাসা করা কি ঠিক হবে? না, এর চেয়ে চুপ করে থাকব? এ দোলাচল চক্রের চারদিকে ঘুরতে থাকি, ততক্ষণে আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে যাই।

মাহাথির বলে, মৃদু কণ্ঠে, 'চুপ থাক!'

একটা মাঝারি সাইজের রুমের মধ্যে ঢুকে চিরায়ত অট্টহাসি দিয়ে বলে, 'শাহিন ভাইয়া, কি খবর? ভাল আছেন?'

'এই তো আছি, ভাইয়া। আপনাদের দোয়া।'

'কই, ভাইজান?'

'আরে, তিনি আছেন, আছেন। অস্থির হবেন না। বসেন, বিশ্রাম করেন একটু। আয়েশী ঢঙে চা খান। চা থাক আজ, বরং কফি খান আজ। বেল বাজিয়ে, জানালেন, কৃত্রিম মোলায়েম কণ্ঠে, 'স্যার, একটু আরাম করছেন। তবে, সম্ভবত শেষের দিকে। বসুন তো, সোফার উপর। কিছুক্ষণ খোশালাপ করি। অনেক দিন পরে, এবার আপনি এলেন।'

আলাপের কয়েক মুহূর্ত পরে, তিনি বললেন, 'বসেন, চা খান।' এরপর, বলার সুযোগ না দিয়ে দ্রুতগতিতে নেমে গেলেন নিচ তলার দিকে। আকস্মিক একটা জরুরি কাজ করা বাকি, এখনই করতে হবে। সাহেবের কাজ। এই ছল হেতু, উঠে গেলেন বসার আসন ছেড়ে এবং চলে গেলেন এই বলে, 'এই, আসছি, কিছুক্ষণ দুই বন্ধু মিলে খোশালাপ করুন, এর মধ্যে ফিরে আসছি।'

মাহাথির ও আমি ছাড়া রুমে অন্য কেউ নেই। তখন মাহাথির বলে, 'বুঝছিস, রায়হান, ভাইয়া অতি খুব সৎ ও নীতিপরায়ণ লোক। আজকাল এই রকম লোক কদাচিৎ মেলে।'

কথাটি বলে নিঃশ্বাস ছাড়ে নিচু স্বরে। আমাকে দেখে কোন সুযোগ না দিয়ে পরখ করতে করতে। একটু থেমে এরপর বলে, 'ভাইয়া, চাকরিটা ম্যানেজ করেছে আমার জন্য। দেখামাত্র ঠিকানা দেবেন। দুই-একদিনের মধ্যে জয়েন। অফুরন্ত খুশির আভা নৃত্য করছে তার চোখে-মুখে, আমি দেখতে থাকি, একা একা, নীরবে; তীব্র গরম অসহ্য পর্যায়ে, সেই সময়, উপলব্ধি করি একটা শীতল স্পর্শ আমার শরীরের সর্বত্র বয়ে যাচ্ছে, ঠিক মৃদু বাতাস।

এভাবে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা আমার সহ্য হচ্ছিল না। মাহাথির জানায়, 'চল, এবার যাই।'

কথাটি বলে উঠে দাঁড়ায় এবং পা বাড়ায় সামনের দিকে।

পেছন থেকে ওকে বলি, 'এভাবে যাওয়া ঠিক হবে? অপেক্ষা করি কিছুক্ষণ, ভাল হয় না?'

'দূর বোকা, রাখ যতসব ফরমালিটি। ভাইয়ার দরজা সবসময় খোলা, বিশেষত আমার জন্য।' মাহাথির বলে বেরিয়ে পড়ে পিএসের রুম থেকে।

সে ফিরে তাকায় না পিএসের দিকে। তারও কিছু বলার থাকতে পারে, কিন্তু ওদিকে ওর ভ্রুক্ষেপ নেই। নিঃশব্দে আমি তাকে অনুসরণ করি আষ্টেপৃষ্ঠে থাকা ছায়া-মানুষের মত।

ভাইয়ার রুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে, হঠাৎ ব্রেক ধরা গাড়ি। দেখে, দরজা ভেজানো। হালকাভাবে ধাক্কা দিলে দরজাটি খুলে যাবে পুরোপুরি।

এর পরিণতি না ভেবে মাহাথির ঢুকে পড়ে রুমের ভেতরে। সঙ্গে আমিও। যেই মাত্র এক পা রুমের ভেতরে ও রাখতে যাবে, ওর চোখ আটকে যায় যে দৃশ্যের উপর, তাতে কী করবে এই মুহূর্তে, কিংবা এ রকম পরিস্থিতি হেতু তার কী

কথাটি বলে নিঃশ্বাস ছাড়ে নিচু স্বরে। আমাকে দেখে, কোন সুযোগ না দিয়ে পরখ করতে করতে, একটু থেমে, এরপর বলে, 'ভাইয়া, চাকরিটা ম্যানেজ করছে। আমার জন্য। দেখামাত্র ঠিকানা দেবেন। দুই-একদিনের মধ্যে জয়েন। অফুরন্ত খুশির আভা নৃত্য করছে তার চোখে-মুখে, আমি দেখতে থাকি, একা একা, নীরবে; তীব্র গরম অসহ্য পর্যায়ে, সেই সময়, উপলব্ধি করি একটা শীতল স্পর্শ আমার শরীরের সর্বত্র বয়ে যাচ্ছে, ঠিক মৃদু বাতাস।

করা উচিত, ওর উপলব্ধির মধ্য দিয়ে নানাবিধ চিন্তার প্রবাহ বয়ে যায়। আদৌ প্রস্তুত ছিল না এমত পরিস্থিতির জন্য। সে খুব প্রচণ্ড শক্‌ড হয়। ওর ভেতরটা খানখান হয়ে যায়, যেমত ফ্লোরে গ্লাস পড়ে গেলে চূর্ণবিচূর্ণ হয়।

ও কষ্ট পায়, বলতে পারছে না। তার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে পড়ে ধীরে ধীরে।

একটি জগদ্দল পাথর চাপে ওর মুখের উপর। কোন শব্দ বের হল না তার মুখে থেকে যেন বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ওর চোখের ঘোলাটে ভাব স্থির ও শান্ত হয়ে এলে লক্ষ্য করে, আনুমানিক ৫০/৫৫ বছরের পুরুষটি দাঁড়িয়ে পড়ে বিছানা ছেড়ে– ভীত ও সন্ত্রস্ত। এক সুতো কাপড়ও তার শরীরে নেই। পলকের মধ্যে নিজের দেহকে ঢেকে নেয় একটা তোয়ালে দিয়ে। রুমের এক কোণে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে, মাহাথির তাকে খুব ভাল চেনে; তারা এক অন্যকে চেনে ও জানে ভার্সিটি লাইফ থেকে, এবং মাহাথিরের সমস্ত প্রেম ও আবেগ অর্পিত এই মেয়েটির কাছে, এবং সেই মেয়েটি এখন দাঁড়ানো তার সামনে মূর্তিমান ও অনুভূতিশূন্য হয়ে। একতিল কাপড় নেই তার শরীরে। লোকটি একটা তোয়ালে ছুঁড়ে দেয় মেয়েটির দিকে, মেয়েটি তা লুফে নেয়, এবং তার নিজের শরীর মোড়ে।

মাহাথির কথা বলে, 'ভাই আ... আ... নাহিদ... তুই... '

মাহাথির একটি শব্দ মুখ থেকে বের করতে পারে না, ওর বড় ভাই সুযোগ দেয় না, বরং বলে, প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হয়ে, 'জানোয়ার, তুই... তুই... তুই... এখানে... এখানে... তুই কিভাবে আসলি?'

লোকটির বলা হয় না আর। বলতেও পারে কিছু। তার চোখ দুটো ভয়ংকর বিস্ফারিত, লাল আগুনের পিণ্ড, সেখান থেকে কালো ধোঁয়া বের হয়ে আসছে, যেন অগ্নেয়গিরির লাভা।

লোকটি ঠেলে মাহাথিরকে নিয়ে যায় দরজার অপর পাশে, ধাক্কা দিতে দিতে, ঠেলে ঠেলে। এরপর দরজা বন্ধ করে তার চোখের ওপর; বিকট আওয়াজ হয় দরজার। মাহাথির ঘুরে দাঁড়ায়, এবং দেখে, ওর মুখের সামনে একটি রুম, এবং লোকটির পিএস দাঁড়ানো সেই রুমের দরজার বাঁ পাশে। পিএসের চোখে ওর চোখ পড়তে, বলে, 'এ কী করলেন!'

মাহাথির দাঁড়ানো, নিশ্চুপ। ওর মুখ থেকে যেন কথা উবে গেছে। স্ট্যাচু হয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

আমার খুব ক্লান্ত লাগছে। যেন আমি খুব দৌড়িয়েছি– শরীরের সমস্ত শক্তি নিয়ে দৌড়িয়েছি। দৌড়তে দৌড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাই হাঁফাতে হাঁফাতে মাহাথিরকে বলি, 'জলদি আয়, আর দাঁড়াস নে, এক মুহূর্ত। ভীষণ বিপদ আসছে। দৌড়া। এখুনি।'

আমরা উভয়ে দৌড়াই। নিজেদের প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে। দৌড়নোর সময় পেছনের দিকে তাকানো হয় না। এই অনুভূতি চিন্তার গভীর দেশে পাথর চাপা থাকে। দৌড়তে দৌড়তে আমরা দাঁড়াই গিয়ে মেইন রাস্তার উপর। রাস্তার উপর উঠে আসার আগে আমরা কোথাও থামি না এক মুহূর্তের জন্য। এরপর আমরা তপ্ত নিঃশ্বাস ত্যাগ করি। এবার পেছনের দিকে দৃষ্টি ফেলি, দেখি, কোথাও কেউ নেই, কোন মানুষ দেখা যায় না। মুহূর্তের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল আমার ভেতর থেকে। আমি দেখছি, সেই সময়ও, মাহাথির প্রচণ্ড কাঁপছে এবং বিকট শব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ছে, ঠিক যেভাবে একটি সদ্য জবাইকৃত বীর্যবান ষাঁড়ের আওয়াজ ভারাক্রান্ত করে চারদিক বিষণ্নতায়, একই রকমভাবে মাহাথির সংক্রামিত করে আমাকে।

তিন.

এইতো কিছুক্ষণ হবে, সন্ধ্যা নেমে পড়ছে চারদিকে, গাঢ় কালো রঙ, ঠিক পাখির মত ডানা বিস্তৃত করে। বাঁ হাতের ঘড়ির উপর আমি চোখ রাখলাম, এখন ৬টা ১৭ মিনিট। বাতিগুলো জ্বলতে শুরু করেছে, রাস্তাগুলো মনে হচ্ছে ফাঁকা-ফাঁকা। অকস্মাৎ মানুষের ভীড় নামল লোকশূন্য রাস্তার উপর, পোনা মাছের ঝাঁকের মত। আমার চোখজোড়া অস্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারত, কিন্তু কোনরকম ভাবাবেগ তাড়িত করল না আমাদের। কিছু প্রশ্ন স্তূপ হতে থাকে আমার চিন্তাপ্রবাহের পৃষ্ঠদেশের উপর, যেন বাঁধ-ভাঙা গঙ্গার প্রবল স্রোতপ্রবাহের তোড়।

ফ্যাক্টরির ছেলেমেয়েগুলো কি তবে আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গেছে? তাই রাস্তাগুলো দেখাচ্ছে লোকশূন্য, নীরব, ঠাণ্ডা। নানা প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি মারে আমার চিন্তায়, এবং পরে তা মিলিয়ে গেল দূর শূন্যতায়, মুহূর্তে। ইতোমধ্যে, আমরা পার হই ৩১ নং ধানমন্ডি রোড, পরে একটি জনমানবহীন রাস্তা ধরে হাঁটি। হাঁটার সময় কোন বাক্য বিনিময় হয় না আমাদের মধ্যে, চুপচাপ আমরা দু'জন হেঁটে চলি– যেন উদ্দেশ্যহীন আগন্তুক।

হঠাৎ মাহাথির জানতে চায়, 'রায়হান, মনে হচ্ছে, এখন আমার কান্না করা উচিত। এই মুহূর্তে, আমার কি তা-ই করা উচিত, তুই কি বলিস? আমি কি এখন কাঁদব?'

এখন আমি ওকে কি বলব? কি বলা প্রয়োজন, কিংবা কি করা কর্তব্য? আমার চেতনা আমার সঙ্গে প্রতারণা করছে। তবু আমি তালাশ করি দক্ষ সাঁড়াশির মত; একজন মানুষ সমুদ্রের অথৈ জলের মধ্যে পড়ে যে আচরণ করতে থাকে বাঁচতে, আমিও তাই করতে থাকি, এই ভেবে, যদি... ।

কিন্তু এর কিছু আমি বুঝে উঠতে পারছি না। আমি শুধু ভেবে যাচ্ছি এ নিয়ে। সবকিছু থেকে যাচ্ছে আমার সচেতনতার বাইরে। না ভেবে, আমি জানাই, 'কাঁদতে ইচ্ছে করছে? তবে কাঁদ, যতক্ষণ ইচ্ছে করবে, কাঁদ। কান্না চেপে রাখিস নে মনে।'

যা বলি, পড়তে পারে না মাটির উপর, ফুঁসে-ওটা নদীর মত চোখের কোটর ভেঙে অশ্রু ছাপিয়ে পড়ে মুখাবয়ব, এর থেকে বুকে, ক্রমশ সারা শরীরে; আকস্মিকভাবে, মাহাথির আমাকে আঁকড়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে, হাউমাউ বিশ্রী শব্দে, এবং একটু পর পর লম্বা লম্বা শ্বাস নিতে থাকে আর বলতে থাকে, 'রায়হান, আমার সব শেষ। আমার কিছু অবশিষ্ট রইল না; নাহিদ, এ কি করলি? নাহিদ... ওরে নাহিদ... তোকে আমি কত... আর তুই কিনা...'

মাহাথির কাঁদতে পারছে না। আমার পিঠ ভিজে জবজব, তার অশ্রু হেতু। তখনো ওর মুখ রাখা আমার বাঁ দিকে কাঁধের উপর। আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না আর; বুকের অতল থেকে কান্না উঠে আসতে লাগল বন্দুকের নল থেকে বের হওয়া গুলির মত, একের পর এক। আমিও তাকে জড়িয়ে ধরলাম। শক্তভাবে। মা-মুরগি যেমন আঁকড়ে ধরে তার ছানা, যাতে একটি ঈগলও কোনভাবে ছিনিয়ে নিতে না পারে তার ছানা। আমরা উভয়ে কাঁদতে থাকি, আঁকড়ে ধরে। কাঁদতে কাঁদতে গোঙাতে গোঙাতে আমি বলতে থাকি, 'তুই শালা, একটা শুয়োর, কে নাহিদ, তুই চিনিস না? আমি তারে চিনি না? আমরা কেউ কাউকে চিনি না। চারদিকে সব কিছু মিথ্যে, ঝুট। আমাদের আপন ছিল না কোনখানে, আমাদের ছিল না স্বজন... আমাদের কেউ নেই, কেউ নেই...'

আমাদের কান্নাগুলো দলা বাঁধতে থাকে, যেমত সন্ধ্যেবেলা লেকের শান্ত স্নিগ্ধ জল চুপচাপ হয়। ধীরে ধীরে।

হামিদ রায়হান
ছোটগল্পকার

লোকটির বয়স আনুমানিক ৫০/৫৫ বছর, পুরুষটি দাঁড়িয়ে পড়ে বিছানা ছেড়ে, ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে। এক সুতো পোশাকও তার শরীরে নেই। এক পলকের মধ্যে, নিজের দেহকে ঢেকে নেয় একটা তোয়ালে দিয়ে। রুমের এক কোণে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, মাহাথির তাকে খুব ভাল চেনে; তারা এক অন্যকে চেনে ও জানে ভার্সিটি লাইফ থেকে, এবং মাহাথিরের সমস্ত প্রেম ও আবেগ অর্পিত এই মেয়েটির কাছে, এবং সেই মেয়েটি এখন দাঁড়ানো তার সামনে, মূর্তিমান ও অনুভূতিশূন্য হয়ে।

ভ্রমণ

জয়পুর-আজমীর-পুষ্কর

জ্যোতিবিকাশ বড়ুয়া

এবারের ভ্রমণকাহিনি ১৯৮৭-৮৮ সালের ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসের। সার্কের অধীনে ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অফ হাইওয়ে ইঞ্জিনিয়ার্স'-এ একমাসের প্রশিক্ষণে বাংলাদেশের সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর থেকে আমরা তৎকালীন দুই নির্বাহী প্রকৌশলী যোগ দিয়েছিলাম। সে-সময় ফিল্ড ভিজিট ও সাইট সিয়িং ট্যুর-এ রাজস্থানের জয়পুর, আজমীর, পুষ্কর ও সারিস্কা ভ্রমণের বর্ণনা এবারের বিষয়।

আমাদের ট্রেনিং প্রোগ্রামে দেখানো ছিল ২৩ থেকে ২৮ ডিসেম্বর ফিল্ড ভিজিট ও সাইট সিয়িং। কিন্তু কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে তা লেখা ছিল না। ২২ তারিখ ট্রেনিং সেশন শেষে প্রশিক্ষণ পরিচালক সাক্সেনাসাহেব জানালেন, কাল সকালে আমরা জয়পুর ও আজমীর দেখতে যাব। কাজেই সকাল সাতটার মধ্যে যেন আমরা রেডি হয়ে থাকি।

২৩ তারিখ সকালে একটি এসি বাস সাতটার আগেই আমাদের রেস্ট হাউসের কাছে এসে দাঁড়াল। ঠিক সাতটায় সাক্সেনাসাহেব হাজির হন। আমরা বাসে উঠে পড়লাম।

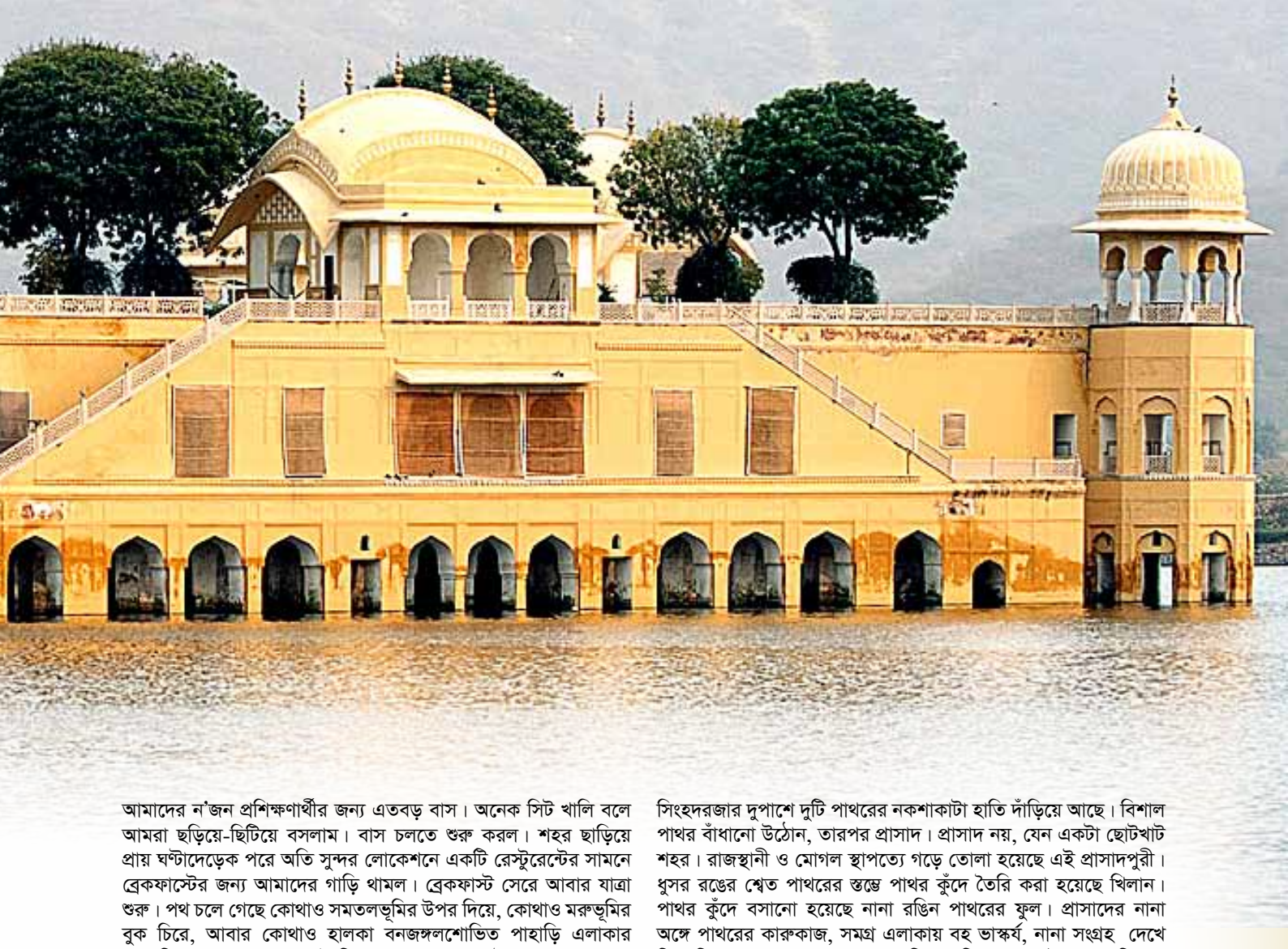

আমাদের ন'জন প্রশিক্ষণার্থীর জন্য এতবড় বাস। অনেক সিট খালি বলে আমরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসলাম। বাস চলতে শুরু করল। শহর ছাড়িয়ে প্রায় ঘণ্টাদেড়েক পরে অতি সুন্দর লোকেশনে একটি রেস্টুরেন্টের সামনে ব্রেকফাস্টের জন্য আমাদের গাড়ি থামল। ব্রেকফাস্ট সেরে আবার যাত্রা শুরু। পথ চলে গেছে কোথাও সমতলভূমির উপর দিয়ে, কোথাও মরুভূমির বুক চিরে, আবার কোথাও হালকা বনজঙ্গলশোভিত পাহাড়ি এলাকার মধ্য দিয়ে। দু'পাশের দৃশ্য বৈচিত্র্যে ভরা। বেলা দুটোয় আমরা জয়পুর পৌঁছলাম। নির্দিষ্ট হোটেলে লাগেজপত্র রেখে হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চ করলাম। তারপর বেরোলাম জয়পুর শহর দেখতে।

আরাবল্লি পার্বত্য এলাকার প্রান্তসীমায় ১৫০০ ফুট উচ্চতায় জয়পুর শহরটি 'পিঙ্ক সিটি' নামে খ্যাত। লাল আর গোলাপি বেলে পাথরে তৈরি প্রাসাদনগরী জয়পুর পর্যটকদের কাছে এক স্বপ্নরাজ্য। প্রশস্ত রাজপথ, রাজস্থানী ও মোগল স্থাপত্যে নির্মিত প্রাসাদোপম বাড়িঘর, জানালায় অপরূপ জাফরির কাজ– এমনটি শুধু ভারতে নয়, সারা বিশ্বেও বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। জয়পুরের এইসব বর্ণাঢ্য স্থাপনার পিছনে আছে নানা চমকপ্রদ ঘটনা ও কাহিনি, যা রূপকথার গল্পকেও হার মানায়। তাই জয়পুর ভ্রমণের কথা শুনেই রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম।

১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ১৩ বছর বয়সে অম্বরের সিংহাসনে বসেন সওয়াই জয় সিং। তখন রাজধানী ছিল অম্বর পাহাড়ে। কাজকর্মের সুবিধার জন্য তিনি রাজধানী স্থানান্তর করেন সমতলে। তাঁর নিজের পরিকল্পনায় এ শহর গড়ে ওঠে। তবে নগর পরিকল্পনায় তাঁর সহযোগী স্থপতি ছিলেন একজন বাঙালি, বিদ্যাধর ভট্টাচার্য। রাজা জয় সিংয়ের নামে রাজধানীর নাম হয় জয়পুর।

আমার স্বপ্নের শহর দেখতে বের হয়ে শহরের রাস্তাঘাট বাড়িঘরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যকর্ম দেখে সত্যি অবাক হলাম। ছোটবেলায় ইতিহাসের বইয়ে রাজপুতদের শৌর্যবীর্য ও বীরত্বের কাহিনি যত পড়েছি, সেই তুলনায় তাঁদের শিল্প, সংস্কৃতির কথা তেমন পড়িনি। সাধারণ ইতিহাস বই যুদ্ধ-বিগ্রহের বিবরণে ঠাসা থাকে, তাতে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির খবর খুব কমই থাকে। প্রথম দর্শনে রাজপুতদের শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য দেখে মুগ্ধ হলাম। আমরা প্রথমে গেলাম জয়পুরের নগরপ্রাসাদ বা সিটি প্যালেসে। সিংহদরজার দুপাশে দুটি পাথরের নকশাকাটা হাতি দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল পাথর বাঁধানো উঠোন, তারপর প্রাসাদ। প্রাসাদ নয়, যেন একটা ছোটখাট শহর। রাজস্থানী ও মোগল স্থাপত্যে গড়ে তোলা হয়েছে এই প্রাসাদপুরী। ধুসর রঙের শ্বেত পাথরের স্তম্ভে পাথর কুঁদে তৈরি করা হয়েছে খিলান। পাথর কুঁদে বসানো হয়েছে নানা রঙিন পাথরের ফুল। প্রাসাদের নানা অঙ্গে পাথরের কারুকাজ, সমগ্র এলাকায় বহু ভাস্কর্য, নানা সংগ্রহ দেখে বিমোহিত হলাম। মূল প্রাসাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে সওয়াই মাধো সিংএর গড়া অতি আকর্ষণীয় শ্বেতশুভ্র দ্বিতল মুবারক মহল। ভবনটির পাথরের কারুকাজ অনবদ্য। প্রাসাদ চত্বরে আর এক দর্শনীয় বিষয় হচ্ছে জ্যোতিষ মানমন্দির 'যন্তর মন্তর'। জ্যোতির্বিজ্ঞানী রাজা সওয়াই জয় সিংয়ের হাতে গড়া পাঁচটি 'যন্তর মন্তর'-এর মধ্যে এটি বৃহত্তম। বাকি চারটি দিল্লি, বারানসী, উজ্জয়িনী ও মথুরায় অবস্থিত। দিল্লির যন্তর মন্তর খুটিয়ে খুটিয়ে দেখেছিলাম বলে এখানে আর বেশি সময় নষ্ট করলাম না।

সিটি প্যালেসের পশ্চিম চত্বর থেকে বেরুতেই ত্রিপোলিয়া বাজার। একটু এগিয়েই জয়পুরের আর একটি অন্যতম প্রধান আকর্ষণ 'হাওয়া মহল'। বিস্ময়কর স্থাপত্যে গোলাপি রঙের বেলেপাথরে নির্মিত পাঁচতলা মৌচাকধর্মী ভবন। ১৭৯৯ সালে মহারাজা সওয়াই প্রতাপ সিং এটি নির্মাণ করেছিলেন ৫৯৩টি পাথরের পর্দার মধ্য দিয়ে রাজমহিষীদের রাজপথ দেখানোর জন্য। ভবনটির অর্ধ অষ্টভুজাকার ঝোলানো গবাক্ষ, জালি ও জাফরির কাজ, ছাদ, গম্বুজ সবকিছুই অপূর্ব বৈচিত্র্যময়। এটি এমন স্থাপত্যে নির্মিত, ১৫২টি জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া প্রবেশ করে মহলকে শীতল করছে– কোন যন্ত্র ছাড়া বাতানুকুল ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। এজন্য এর নাম 'হাওয়ামহল'। আমরা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম। ভবনের দেয়াল ভাল করে দেখে বুঝলাম পুরুত্ব আট-নয় ইঞ্চির বেশি নয়। জানালাগুলিতে রয়েছে জালি। এই জালি দিয়েই হাওয়া প্রাসাদের ভিতরে আসে। উপর থেকে শহরের অনেক এলাকা দৃশ্যমান হয়। এক সময় উপর থেকে নীচে নেমে এলাম। ফিরে যেতে যেতে ভাবলাম রাজা-মহারাজাদের এসব অনুপম কীর্তি ও অপরূপ সৃষ্টির কথা।

এরপর আমরা এলাম হাওয়ামহলের ডাইনে জহুরি বাজারে। বাজারে দেখি লোকজনের বেশ ভীড়। রাজস্থানী নারীপুরুষদের বেশভূষা বেশ

বৈচিত্র্যময়। মহিলারা পরেছে রঙ-বেরঙের ঘাঘরা, কাঁচুলি আর ওড়না। তার সঙ্গে আছে হাঁসুলি, ঝুমকো ও মলের মত গয়না। পুরুষদের মাথায় নানা রকমের পাগড়ি। রত্নখচিত অলঙ্কারের জন্য জহুরি বাজারের নামডাক। জুয়েলারির নানান জিনিস ছাড়াও আছে রাজস্থানী কারুকার্যের নানা সম্ভার– ব্লক প্রিন্ট, ব্লু-পটারি, মিরর ওয়ার্ক, রূপোর গয়না ও বাঁধুনি শাড়ির অনেক দোকানপাট। অসাধারণ হস্তশিল্পের জন্য রাজস্থানের সুনাম। বিপনিগুলিতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে হস্তশিল্পের সব বাহারি সম্ভার। দেখলে কিনতে ইচ্ছে করে। আমার সহযাত্রীদের কয়েকজনের কেনাকাটায় খুব উৎসাহ। তাঁরা বেশকিছু সওদা করলেন। পাকিস্তানের ইউসুফ আলি ও আমার এসবে উৎসাহ নেই। আমরা দু'জনে কিছু কিনলাম না। আমরা কেনাকাটার চেয়ে চলমান হাস্যোজ্জ্বল চঞ্চলা রাজপুতানীদের দেখায় বেশি মনোযোগ দিলাম। কেনাকাটা নিয়ে বেশি সময় নষ্ট করায় সোলাঙ্গির সঙ্গে ইউসুফের একচোট ঝগড়া হয়ে গেল।

শহরের দক্ষিণে এক বিশাল উদ্যানে রয়েছে বিরাট জাদুঘর ভবন। বেলেপাথর আর শ্বেতপাথরে নির্মিত এই প্রাসাদোপম বাড়িটির স্থাপত্য স্থাপত্যশিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। আমরা যখন জাদুঘরের সামনে এলাম, যাদুঘর বন্ধ হওয়ার পথে। তাই ভেতরে ঢুকতে পারলাম না। তবু জাদুঘর ভবনটি দেখেও কম তৃপ্ত হইনি।

২৪ ডিসেম্বর সকালে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল ৮নং জাতীয় মহাসড়ক পরিদর্শনে। সেখানে আমরা প্রায় সারাদিন ধরে নির্মাণাধীন (পুনর্নির্মাণ) সড়কের নির্মাণ কাজের বিভিন্ন স্তর এবং ফিল্ড ল্যাবরেটরির বিভিন্ন কাজ দেখলাম। দেখলাম সড়কের কাজ করছে একদল রাজপুত মহিলা শ্রমিক। তাদের সবাই প্রায় যুবতী ও কিশোরী। শ্রমিকের কাজ করতে এলেও সাজসজ্জার অভাব নেই। পরণে বর্ণাঢ্য ঘাঘরা, কাঁচুলি ও ওড়না, কানে, গলায় ও হাতে রকমারি সব কাচের ও রূপার ও পাথরের অলঙ্কার। আর মুখে হাসিটি লেগেই আছে। ছবি তুলতে চাইলে, কাপড়চোপড় ঠিকঠাক করে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। সন্ধ্যার আগে আমরা জয়পুরে ফিরে এলাম।

২৫ ডিসেম্বর আমাদের নিয়ে যাওয়া হল জয়পুর থেকে ৬ কিলোমিটার উত্তরপূর্বে পাহাড় চূড়ায় নাহারগড় ও জয়গড় দুর্গ দেখাতে। সর্পিল খাড়া পাহাড়ি পথে আমাদের বহনকারী বাস অনেক উপরে ওঠে। এরকম দুর্গম পথে এতবড় বাস চালিয়ে এত উপরে ওঠা সত্যি দুঃসাহসিক ব্যাপার। এজন্য বাসের ড্রাইভারকে ধন্যবাদ দিলাম। বাস থেকে নেমে আরো বেশ খানিকটা চড়াই বেয়ে উপরে উঠতে হয়। পর্বতশীর্ষে দুর্গ, শত্রুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকার আদর্শ অবস্থান। দুর্গ এলাকা থেকে চারিদিকের দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। বিশেষ করে পাহাড়ের নীচে অদূরে মনসাগরের বুকে প্রতাপ সিংয়ের তৈরি অপরূপ 'জলমহল'।

নাহারগড় দুর্গের অনতিদূরে জয়গড় দুর্গ। দুর্গ চত্বরে প্রবেশ করে প্রথমে চোখে পড়ল এক বিশাল কামান। এটি নাকি পৃথিবীর বৃহত্তম কামান। কামানের নলের ব্যাস ৯ ফুট, দৈর্ঘ্য ২০ ফুট, ওজন ২৫০ টন। একবার গোলা ছুঁড়তে ১০০ কেজি গান পাউডার লাগে। দুর্গ এলাকায় সুন্দর অলংকৃত রানিমহলটি দেখবার মত। দ্বিতল রানিমহলের নীচে জলের বিশাল রিজার্ভার বা জলাধার, বাইরে থেকে সহজে নজরে আসে না। এই জলাধারের আয়তন ১৫৮x১৫৮ ফুট, গভীরতা ৪০ ফুট। এর ছাদ ধারণ করে আছে ৮১টি পাথরের পিলার। জলাধারের উপরে নির্মাণ করা হয়েছে প্রাসাদ, যেন রিজার্ভারে পানি ঠাণ্ডা থাকে এবং রাজস্থানের প্রচণ্ড গরমে বাষ্প হয়ে না যায়। এই পানির উৎস বৃষ্টির পানি। কিন্তু এখানে সারা বছরে বৃষ্টিপাত ১০ ইঞ্চির নীচে। এই সামান্য বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে রাখার জন্য সমগ্র দুর্গ চত্বর ও পাহাড়ের ঢাল পাকা করা হয়েছে। পাকা চত্বরের ঢাল এমনভাবে করা হয়েছে যেন বৃষ্টির পানি গড়িয়ে গিয়ে রিজার্ভারে সঞ্চিত হয়। এই জলাধার নিয়ে একটি ঐতিহাসিক গল্প আছে:

রাজপুতদের ওপর যখন বহিরাক্রমণ হত, বিশেষ করে বার বার মোগল অভিযানের কালে আত্মরক্ষার জন্য সবাই দুর্গ ছেড়ে বনজঙ্গলে আশ্রয় নিতেন, সে সময় দুর্গে বসবাসকারী রানিসহ সকল রাজপুত রমণী দুর্গ ছেড়ে যাবার সময় তাদের মণিমুক্তা, হীরা-জহরত ও স্বর্ণের অলঙ্কারাদি এই জলাধারে ফেলে দিয়ে যেতেন। উদ্দেশ্য নিরাপদে সংরক্ষণ এবং ফিরে এসে যেন জলাধার থেকে সহজে তুলে নিতে পারেন। কিন্তু আক্রমণ স্তিমিত হয়ে এলে বা পরিস্থিতি অনুকূল হলে তাঁরা ফিরে এলেও জলাধারের ঐসব অলঙ্কার তুলতেন না। নতুন করে আবার অলঙ্কারাদি সংগ্রহ বা তৈরি করে নিতেন। এভাবে দীর্ঘদিন ধরে জলাধারে প্রচুর মূল্যবান সম্পদ সঞ্চিত হতে থাকে। জয়সিংহ রাজা হওয়ার পর জলাধারের সব জল সিঞ্চন করে দীর্ঘদিনের সঞ্চিত বিপুল পরিমাণ মণিমুক্তা, হীরা-জহরত ও স্বর্ণ উদ্ধার করেন। এই ধনরাশির বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে তিনি জয়পুর শহর বা 'পিঙ্ক সিটি অফ জয়পুর' গড়ে তোলেন।

গল্পটি এখানে শেষ নয়। ইন্দিরা গান্ধী যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী, তাঁকে জানানো হল, এই জলাধারে রাজপুত রমণীদের ফেলে যাওয়া প্রচুর মূল্যবান গহনাদি সঞ্চিত আছে। তিনি জল সিঞ্চন করে সঞ্চিত স্বর্ণ, মণিরত্ন উদ্ধারের নির্দেশ দিলেন। তাঁর নির্দেশে জলাধারের সব জল সরানো হল কিন্তু এবার জলাধারের তলায় কিছুই পাওয়া গেল না।

জয়পুরে ফিরে আমরা দুপুরের খাবার খেলাম। তারপর গেরাম জয়পুর থেকে ৮ কিলোমিটার দক্ষিণে 'শিশোদিয়া রানি'র বাগানে যা 'রানি কা বাগ' নামে পরিচিত। ফোয়ারাশোভিত বিশাল বাগিচার মাঝে সওয়াই জয় সিংএর দ্বিতীয় মহিষী শিশোদিয়া রানির প্রাসাদ। শহরের কোলাহল থেকে দূরে বনানীর প্রান্তে চারিদিকে গাছপালাশোভিত সবুজের মাঝে এর নান্দনিক অবস্থান অনবদ্য। প্রাসাদের দেয়ালে অঙ্কিত রঙিন ম্যুরাল দর্শনীয়।

সাক্সেনাসাহেবের কাছে এই বাগিচা ও প্রাসাদ সৃষ্টির সুন্দর কাহিনি বা ইতিহাস জানতে চাইলে তিনি জানালেন– তিনি জানেন না।

আমি বললাম– তাহলে শুনুন আমার কাছে: মহারাজা সওয়াই জয় সিং সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন অতি কম বয়সে। প্রথম যৌবনেই রাজপ্রাসাদে আসেন প্রথম মহিষী। মহারাজা তাঁর যৌবনের মধ্যগগনে অনেক নারীর সংস্পর্শে আসেন। তার মধ্যে একজন ছিলেন মেবারসুন্দরী 'শিশোদিয়া'। তাঁর প্রতি মহারাজার অনুরাগ ছিল প্রবল। তিনি তাঁকে রানির মর্যাদা দিয়ে রাজপ্রাসাদে তুলতে চান।

তখন শিশোদিয়া বলেন, 'আমি আপনার ঐ জ্যেষ্ঠ রানির সঙ্গে একই রাজপ্রাসাদে থাকতে পারব না। রাজধানীর বাইরে রাজপ্রাসাদ থেকে অনেক দূরে আমার জন্য আলাদা প্রাসাদ নির্মাণ করে দিতে হবে।'

রাজা বললেন– 'তাই হবে।'

তখন রানি বললেন– 'শুধু তাতেও হবে না। কথা দিতে হবে, আমার ছেলে হলে সে-ই সিংহাসনের উত্তরাধিকার হবে, বড় রানির বড় ছেলে নয়।'

বড় রানির বড় ছেলে ঈশ্বরী সিং ছিল মহারাজার অতি আদরের এবং রূপে-গুণে অতুলনীয়। মহারাজাসহ সকলের কাছে এটি পরিষ্কার ছিল যে মহারাজের মৃত্যুর পর যুবরাজ ঈশ্বরী সিং পিতার স্থলাভিষিক্ত হবেন। কাজেই এই শর্ত মানা মহারাজের জন্য ছিল খুবই কষ্টকর। তবু তিনি তখন শিশোদিয়ার প্রেমে এমন অন্ধ ছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত এই শর্তও তিনি মেনে নিলেন। তারই ফলশ্রুতিতে এই 'শিশোদিয়া বাগান' বা 'রানি কা বাগ'-এর সৃষ্টি।

আমার এই পর্যন্ত বলার পর সাক্সেনাসাহেব প্রশ্ন করলেন– 'জয় সিংয়ের মৃত্যুর পর যে সওয়াই মাধো সিংই রাজা হয়েছিলেন, তিনি কি দ্বিতীয় মহিষী শিশোদিয়ার পুত্র ছিলেন?'

উত্তরে আমি বলি– হ্যাঁ। তবে জয় সিংয়ের মৃত্যুর পর মাধো সিং সরাসরি রাজা হননি। জয়পুরের সভাসদেরা ঈশ্বরী সিংকেই রাজা মনোনীত এবং সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। কেউ কেউ মাধো সিংয়ের পক্ষাবলম্বন করেন। সেনাবাহিনিও বিভক্ত হয়ে পড়ে। সিংহাসন নিয়ে দুই ভাইয়ের যুদ্ধ শুরু হয়। চার বছর ধরে চলে এই যুদ্ধ। কিন্তু ঘটনাচক্রে হঠাৎ ঈশ্বরী সিং অসুস্থ হয়ে মারা যান। তখন মাধো সিংয়ের সিংহাসন লাভে আর বাধা রইল না। সভাসদেরাও সকলে তাঁকে মেনে নেন। এই হল 'রানি কা বাগ'-এর ইতিহাস বা গল্প।

সন্ধ্যার আগে আমরা জয়পুরে ফিরে এলাম। এরপর কোথায় যাওয়া যায় বা কি করা যায় তা নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা চল্‌ল। সোলাঙ্গি, যোশি ও ভট্টরায়ের বক্তব্য হল, ভারত ভ্রমণে এসে হিন্দি সিনেমা দেখব না, তা হয় না। ভারতীয় দু'জনও তাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। সিনেমার ব্যাপারে সবচেয়ে কম উৎসাহ আমার আর ডি সিলভার। যাহোক সংখ্যাধিক্যের মত মেনে নিতে হল। কাছেই ছিল একটি ভাল সিনেমা হল। আমরা 'জাগো হুয়ে সবেরা' ছবিটি দেখলাম।

২৬ তারিখ সকাল সাড়ে আটটায় জয়পুর থেকে রওনা দিয়ে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে আজমীর পৌঁছলাম। আজমীর শহরটি বেশ পুরনো। সপ্তম শতকে অজয় পাল চৌহান এই শহরের পত্তন করেন। তবে এই শহরের এখনকার নামডাক আকবরের ধর্মগুরু খাজা মইনুদ্দীন চিশতির দরগার কারণে। আনা সাগরের তীরে অনুচ্চ পাহাড়ি ভূখণ্ডে রমণীয় সবুজ পরিবেশে শহরটিকে প্রথম দর্শনে মনে হল মনোমুগ্ধকর।

পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী স্থানীয় পিডব্লিউডি-র অফিসারদের সঙ্গে তাঁদের রেস্ট হাউসে আলোচনায় বসলাম। ওখানকার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বিশ্ব ব্যাংকের সাহায্য বাস্তবায়নাধীন একটি সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের বিভিন্ন দিক তুলে ধরলেন– আমাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিলেন। আলোচনা চা-পর্বের মধ্য দিয়ে শেষ হল। এখানে উল্লেখ্য যে, পাহাড়ের উপর পিডব্লিউডি-র রেস্ট হাউসটির অবস্থানটি চমৎকার। রেস্ট হাউস চত্বর থেকে পশ্চিমে নীচে 'আনা সাগর' নামীয় হ্রদের দৃশ্য নয়নাভিরাম।

আমরা পিডব্লিউডি রেস্ট হাউজ থেকে বের হয়ে পাহাড়ি পথে আনেকখানি নীচে নেমে খাজা মইনুদ্দিন চিশতির দরগা শরীফ এলাকায় এলাম। দরগার আশেপাশের এলাকা বেশ ঘিঞ্জি, চারিদিকে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য গরীব-দুঃখী মানুষ। দরগার সামনে বিশাল তোরণ। খাজা মইনুদ্দিন চিশতি পারস্য থেকে ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ঘোরীর সঙ্গে ভারতে আসেন এবং তখন থেকেই আজমীরে অবস্থান করতে থাকেন। ১২৩৬ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর কবরকে কেন্দ্র করে উপর গড়ে উঠেছে বিশাল দরগা। আলাউদ্দিন খিলজি প্রথমে সমাধিবেদী ও মসজিদ নির্মাণ করেন। পরে মোগল সম্রাটেরা এর শ্রীবৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ করেন। সুফি ধর্মগুরু খাজা মইনুদ্দিন চিশতি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে সমান শ্রদ্ধেয়। খালি পায়ে মাথা ঢেকে দরগায় প্রবেশ করতে হয়। আশরাফ, ইউসুফ ও সোলাঙ্গি পকেট থেকে টুপি বের করে পরে নিলেন। ডি সিলভা, কিরণ, সন্তোষ আর আমি পকেট থেকে রুমাল বের করে মাথায় বাঁধলাম। দরগা চত্বরে বসে অনেক নারী-পুরুষ আপনমনে কোরান পাঠ করছেন। চারপাশে শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ। আমরা দরগা তথা মূল গম্বুজে ঢুকলাম। ভেলভেটে মোড়া শ্বেতপাথরে তৈরি সমাধিবেদী, চারিদিকে রূপোর রেলিং। কবর ভেলভেটের চাদর দিয়ে ঢাকা। এই চাদরের নীচে মাথা ঢুকিয়ে প্রার্থনা করলে নাকি মনস্কামনা পূর্ণ হয়। দেখলাম চাদরটি একেবারে নোংরা। কয়েকজন মাথা ঢোকানোর জন্য চাদর একটু উপরে তুলছিল, একটা বিশ্রী গন্ধ নাকে এসে লাগল। এই নোংরা উৎকট গন্ধের চাদরের নীচে মাথা ঢুকিয়ে কিছু কামনা করা আমার কম্ম নয়। তাছাড়া আমিতো এখানে কিছু চাইতে আসিনি, আমি এসেছি খাজাসাহেবকে শ্রদ্ধা জানাতে। দরগার সবচেয়ে দর্শনীয় হচ্ছে ১২০ ও ৮০ মণ চাল রান্নার বিশাল দু'টি হান্ডা বা ডেক। উরসের সময় হাজার হাজার লোকের জন্য এই দু'টি ডেকে বিরিয়ানি রান্না হয়।

দরগা থেকে বেরিয়ে উত্তরে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথে আমরা এলাম আড়াই-দিন-কা-ঝোপড়া মসজিদের সামনে। এটি আগে ছিল সংস্কৃত কলেজ ও সরস্বতী মন্দির। মুহম্মদ ঘোরীর নির্দেশে আড়াই দিনের মধ্যে এটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। তারপর ঘোরী এখানে নামাজ আদায় করেন।

তারপর আমরা আজমীর থেকে ১১ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে হিন্দু তীর্থ পুষ্করে এলাম। হিন্দুদের এটি একটি অতি প্রাচীন পবিত্র তীর্থস্থান। পাহাড়ের পাদদেশে অতীব সুন্দর পুষ্কর লেক বা সরোবর। তার পাড়ে ব্রহ্মার মন্দির। সারা ভারতে ব্রহ্মার একটিমাত্র মন্দির আছে, সেটি এই পুষ্করে। মন্দির চত্বরে প্রবেশের আগে আছে সুদৃশ্য বিরাট তোরণ। তোরণ দিয়ে প্রবেশ করে ৪৩ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে মূল মন্দিরে প্রবেশ। শ্বেত পাথরে নির্মিত মন্দিরটির স্থাপত্য ভিন্ন রকম, আর কোথাও এরকম স্থাপত্যের মন্দির দেখিনি। মন্দিরের তোরণ থেকে আমাদের ডানে-বামে সামনে-পিছে লেঙ্গুর জাতীয় বেশ কয়েকটি বানর আমাদের সঙ্গী হল। বানর দেখে আশরাফ, সোলাঙ্গি, বিশেষ করে ইউসুফ ঘাবড়ে গেল। ওদের অভয় দিলাম। গর্ভমন্দিরে আছে রক্তবর্ণ চতুরানন হংসবাহন ব্রহ্মার মূর্তি। পাশে গায়ত্রী দেবীর মূর্তি, ব্রহ্মার স্ত্রী সাবিত্রীর নয়। হিন্দুদের বিশ্বাস, পুষ্কর লেকে স্নান করলে পাপ মোচন হয়। পুষ্করের এই লেক, ব্রহ্মার মন্দির ও গায়ত্রী দেবীকে নিয়ে এক সুন্দর পৌরাণিক কাহিনি আছে। সেটি এখানে নিবেদন করা যাক:

কলির প্রভাব থেকে জগৎ-সংসারকে বাঁচাতে ব্রহ্মা স্বর্গ থেকে পদ্ম ছোড়েন পৃথিবীর উদ্দেশ্যে কলিহীন জায়গা খোঁজার জন্য। সেই পদ্ম পুষ্করে এসে

পড়ে। পদ্ম যেখানে পড়ে সেখানে সরোবরের সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মা স্বর্গ থেকে রওনা হন এই পুষ্কর সরোবরের উদ্দেশ্যে। সরোবরের কাছে এসে দেখেন, এক পরমা সুন্দরী নারী সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে সরোবরের জলে স্নানে মত্ত। দেখে ব্রহ্মার রতি কামনা জেগে উঠল। তিনি সেই সুন্দরী নারীকে রতিক্রীড়ায় আহ্বান জানালেন। সুন্দরী তাতে সাড়া দিলেন। এদিকে ব্রহ্মা যখন রতিক্রীড়ায় মত্ত, তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে ব্রহ্মাপত্নী সাবিত্রী বা সরস্বতী সরোবরের পাড়ে এসে উপস্থিত। দু'জনকে প্রমত্ত অবস্থায় দেখে তিনি ব্রহ্মাকে অভিশাপ দিতে দিতে সামনের পাহাড়ে উঠে যেতে থাকেন। ব্রহ্মা দৌড়ে পিছন পিছন গিয়ে তাঁকে ফেরাতে চেষ্টা করেন। বলেন, 'আমি তো মনে করেছি এই নারী তুমিই, কৌতুক করে তুমি অন্য বেশ ধরেছ আমাকে প্রলুব্ধ করার জন্য'। ব্রহ্মার এই মিথ্যা বাক্যে আমল না দিয়ে সাবিত্রী দেবী পাহাড়চূড়ায় উঠে যান। ব্রহ্মাকে সেখানে উঠতে নিষেধ করেন। এখন সেই পাহাড়ের উপরে আছে সাবিত্রী মন্দির, সেখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। পাহাড়ের নাম হয়েছে সাবিত্রী পাহাড়। আর যে সুন্দরী নারীর সঙ্গে ব্রহ্মা অনাচারে লিপ্ত হয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন গায়ত্রী দেবী। সাবিত্রীর অভিশাপে ব্রহ্মা কোথাও পূজা পান না এবং পুষ্কর ছাড়া ভারতের আর কোথাও ব্রহ্মার মন্দির নেই। অপকর্মের উপযুক্ত শাস্তি বটে!

প্রতি বছর কার্তিক পূর্ণিমার সময় পুষ্করে বিরাট মেলা বসে, যার নাম পুষ্কর মেলা বা ক্যামেল ফেয়ার। দূর-দূরান্ত থেকে ব্যাপারিরা আসে তাদের আঞ্চলিক রঙিন বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে। বেচাকেনা হয় উট, ঘোড়া, গরু ইত্যাদি। এছাড়াও থাকে বসন-ভূষণ ও নানা রাজস্থানী সম্ভার। তখন নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দেশ-বিদেশের প্রচুর পর্যটকের সমাগম ঘটে তখন।

সন্ধ্যায় জয়পুর ফিরে এলাম। পরদিন খুব ভোরে জয়পুরের হোটেল থেকে চেক আউট করি। আমাদের পরবর্তী গন্তব্য জয়পুর থেকে ১১০ কিমি দূরে সারিস্কা জাতীয় উদ্যান– বন্য প্রাণীদের অভয়ারণ্য। ১৩ নং জাতীয় মহাসড়ক ধরে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আমরা রাজস্থানের আলোয়ার জেলায় আরাবল্লি পর্বতের মধ্যে সারিস্কা অভয়ারণ্যে পৌঁছলাম। ঘন অরণ্যের মাঝে শান্ত স্নিগ্ধ নির্জন পরিবেশে রাজস্থান পর্যটন দপ্তরের বিরাট রেস্ট হাউজ। গুণে-মানে তারকা হোটেলের সঙ্গে তুলনীয়। শহরের কোলাহল থেকে বহুদূরে প্রকৃতির কোলে এমন মোহনীয় পরিবেশে তারকা হোটেল মানের একটি রেস্ট হাউজ যেন কল্পনার বাইরে। কয়েকদিন আগে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এখানে এসেছিলেন– কেবিনেট বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে অবস্থান করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হল। এখানে আমাদের আগে এসে হাজির হয়েছেন NITHE-এর অধ্যক্ষ ও ভারতের ভূতল পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মি. শিবগুরু। তিনি সার্ক অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের ওপর আলোচনা করেন।

মধ্যাহ্নভোজের পর আমরা সারিস্কা টাইগার স্যাংচুয়ারি দেখতে গেলাম। আরাবল্লি পর্বতমালার পাহাড়ঘেরা শ্যামলিমায় আচ্ছন্ন প্রাকৃতিক অরণ্যভূমি। নানা প্রজাতির বন্য পশুপাখির বিচরণক্ষেত্র। এই অপরূপ অরণ্যানীর আদিম বাসিন্দাদের মানুষের মত নিষ্ঠুর প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ভারত সরকার ১৯৫১ সালে একে অভয়ারণ্য ঘোষণা করে।

আমরা বন দপ্তরের একটা বিশেষ গাড়িতে করে বনে ঢুকলাম। অনেকক্ষণ ঘুরেও বাঘের দেখা পেলাম না। তবে একজোড়া নীলগাই, অনেকগুলি শম্বর, বন্য শুকর, চিত্রল হরিণ ও সাম্বারের দেখা মিলল। অনেক ময়ূর ও লেঙ্গুর দেখলাম। এরা প্রাকৃতিক পরিবেশে তাদের নিজস্ব বিচরণক্ষেত্রে উন্মুক্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর আমরা গাড়ির মধ্যে বন্দী হয়ে আছি। প্রাকৃতিক বনে বন্য প্রাণীদের মাঝে এভাবে ঘুরে বেড়ানো এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। বাঘমামার দেখা না পেলেও, যা দেখলাম তাতে মনপ্রাণ ভরে গেল। জঙ্গলের এক প্রান্তে যেখানে গাড়ির পথ শেষ হয়েছে, সেখানে পাথরের টিলার উপরে গুহার মত একটি জায়গা। এর নাম 'পাণ্ডুপোল'। মহাভারতের আখ্যানে বর্ণিত আছে, কৌরবদের সঙ্গে পাশা খেলে হেরে শর্ত অনুযায়ী পাণ্ডবদের বারো বছর বনবাস ও একবছর অজ্ঞাতবাসে কাটাতে হয়। সেই অজ্ঞাতবাসের একবছর পাণ্ডবেরা এই পাণ্ডুপোলে লুকিয়ে কাটান।

বিকেলে রেস্ট হাউসের সামনের লনে বসে আড্ডায় সময় কাটল।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের পর সারিস্কা থেকে আমরা দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। কয়েক কিলোমিটার আসার পর দেখি পথের পাশে বনের ধারে একটি মেলা বসেছে। আমরা সাক্সেনা সাহেবকে বলে গাড়ি থেকে নেমে মেলা দেখতে গেলাম। আশেপাশে কোন লোকালয় নেই। অনুচ্চ পাহাড়ের পাদদেশে চারিদিকে অরণ্যঘেরা একটি চত্বরে মেলা বসেছে। মেলার এক পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে এক পাহাড়ি ছড়া। ঐ পাহাড়ি ছড়ায় মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নান উপলক্ষে এই মেলা। আমাদের দেশে গ্রাম্য মেলায় যেরকম দোকানপাট বসে, অনেকটা সেরকমই। তবে মেলার পরিবেশগত অবস্থান খুবই সুন্দর। মেলা দেখার জন্য সবচেয়ে বেশি উৎসাহ আমাদের পাকিস্তানী বন্ধু সোলাঙ্গির। তাঁর সবকিছুতে বিস্ময়। তাঁদের দেশে বোধহয় এরকম মেলা হয় না। আমরা মেলায় ঘুরতে গিয়ে দেখি, ছড়ার উপরের দিকে পুরুষ আর নীচের দিকে মেয়েরা স্নান করছে। দেখলাম কম বয়সী যুবতী মেয়েরাও অতি স্বল্পবসনা হয়ে সবার সামনে স্নান করতে নামছে। যখন ভিজে কাপড়ে উঠে আসছে তখন তাদের শরীরের সব খাঁজ ভাঁজ, পর্বত, উপত্যকা, গিরিসঙ্কট দৃশ্যমান। লোকজন সব দেখছে কিন্তু নির্বিকার– যেন সামান্যতম লজ্জাবোধও নেই। সোলাঙ্গিসাহেব স্নানের ছবি তুলতে ক্যামেরা নিয়ে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে বাধা দিয়ে বললাম– 'এটা এদের ধর্মীয় ব্যাপার, হঠাৎ দেখে ফেললে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। নেহাত যদি ছবি তুলতে হয়, প্রকাশ্যে না তুলে কায়দা করে লুকিয়ে তুলতে হবে। আমি একটা হাত একটু ফাঁক করে দাঁড়াই, আপনি আমার বগলের ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে ছবি তোলেন।' তিনি তাই করলেন। এখানে একটা কথা বলা দরকার, পুণ্যার্থী নর-নারী যে ছড়ায় স্নান করছে সেটির জল একবারে নোংরা, ঘোলা ও দুর্গন্ধময়– স্রোত নেই বললেও চলে। এরকম নোংরা দুর্গন্ধময় জলে লোকে স্নান করতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। এরকম নোংরা জলে স্নান করে স্বর্গে যাবার চাইতে আমি হাজার বছর নরকে পচতে রাজি।

৩০ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি আবার ট্রেনিং। পরের দুইদিন অর্থাৎ দুই-তিন তারিখ আমাদের অফ-ডে। ২ জানুয়ারি সকালে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে ট্রেনে কলকাতা থেকে দিল্লিতে এলাম। তাদের রিসিভ করার জন্য আমি দিল্লি রেল স্টেশনে যাই। তারপর ওদের নিয়ে চিত্তরঞ্জন পার্কে আমার এক আত্মীয়ের বাসায় নিয়ে তুললাম। সারা দুপর ও বিকেল ওখানে কাটিয়ে সন্ধ্যায় জোড়বাগ রেস্ট হাউসে ফিরে এলাম।

আজ এতদিন বাদে সেই ভ্রমণস্মৃতি যেন মনে হয় গতকালের। 'স্মৃতি সততই সুখের' যদিও বলেছেন প্রতিভা বসু, তবু বিশ্বকবি কেন লিখলেন, দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না...

জ্যোতিবিকাশ বড়ুয়া
ভ্রমণ লেখক, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা

BE 100% SURE

Dettol

BPMPA

Proud Partner of icddr,b

ডেটল সাবান সুরক্ষা দেয় ১০০ রোগবাহী জীবাণু পর্যন্ত#

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত যে নতুন ডেটল সাবান আপনার পরিবারকে ১০০টি পর্যন্ত রোগবাহী জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয়। এজন্যই ডাক্তাররা সবসময় পরামর্শ দিয়ে আসছেন ডেটল ব্যবহার করার জন্য।

নতুন

সুরক্ষা দেয়

১০০

রোগবাহী জীবাণু পর্যন্ত#

This is supported by Microbiological assessments versus bacteria and fungi at an external GLP facility (Bioscience Laboratories, Bozeman, Montana, USA)

** Dettol Original Soap is a Grade-1 soap

DettolBD

মৃণাল সেন

প্রখ্যাত ভারতীয় বাঙালি চলচ্চিত্র পরিচালক, চিত্রনাট্যকার ও লেখক মৃণাল সেন ১৯২৩ সালের ১৪ মে অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর শহরের এক বর্ধিষ্ণু হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলের পাঠ শেষে পড়াশোনার জন্য তিনি কলকাতায় আসেন এবং স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক শাখার সঙ্গে যুক্ত হন, যদিও তিনি কখনও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হননি। চল্লিশের দশকে তিনি সমাজতান্ত্রিক চেতনাপুষ্ট আইপিটিএ (ইন্ডিয়ান পিপ্‌লস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন)-র সঙ্গে যুক্ত হন এবং এর মাধ্যমে সমমনোভাবাপন্ন মানুষদের কাছাকাছি আসেন।

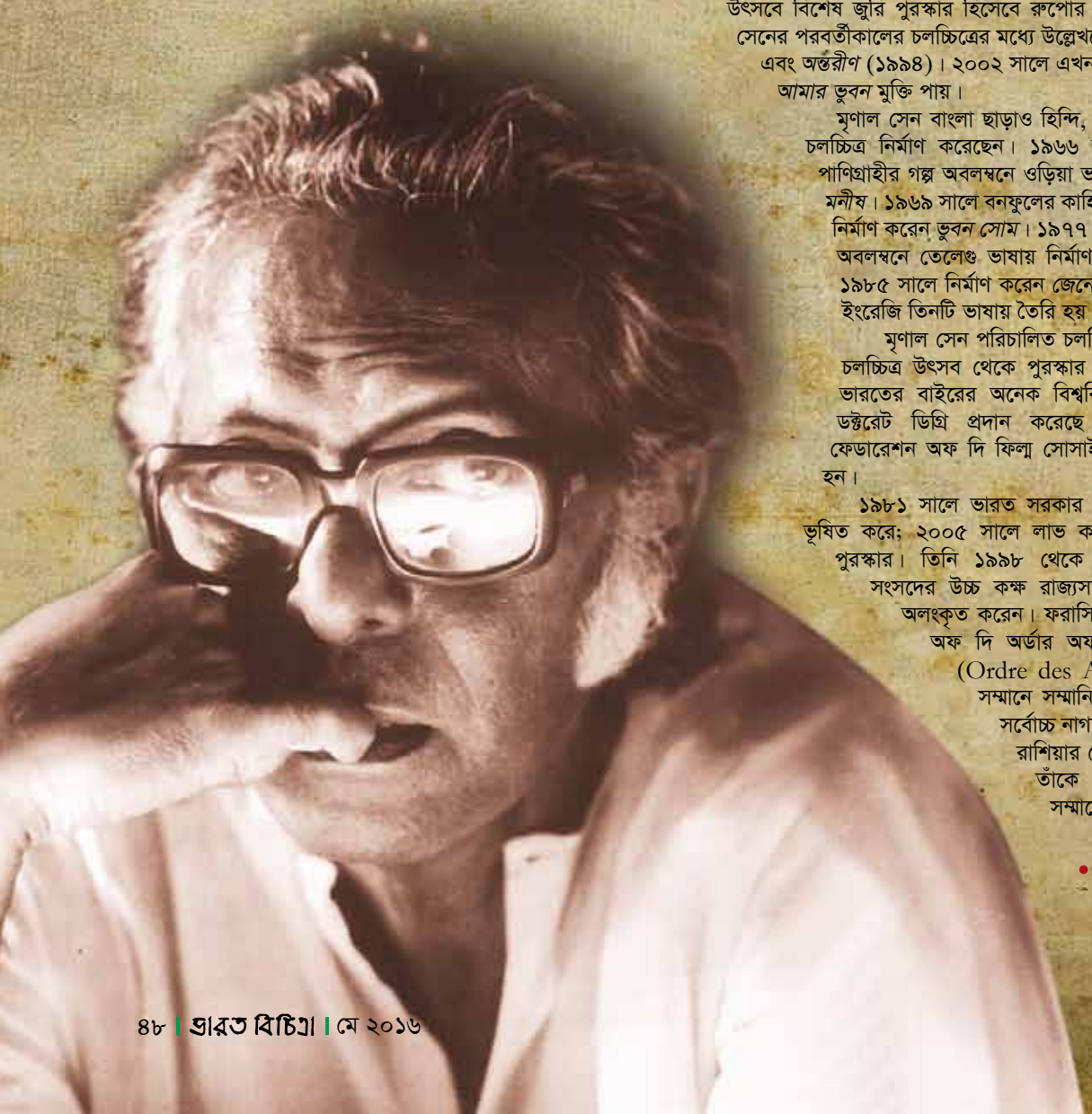

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করে তিনি সাংবাদিকতা, ওষুধ বিপনন এবং চলচ্চিত্রে শব্দকুশলী প্রভৃতি বিচিত্র কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রই তাঁর নেশা ও পেশা হয়ে ওঠে।

১৯৫৫ সালে মৃণাল সেনের প্রথম চলচ্চিত্র *রাতভোর* মুক্তি পায়। এটি তেমন সাফল্য পায়নি। দ্বিতীয় ছবি *নীল আকাশের নীচে* তাঁকে স্থানীয়ভাবে পরিচিতি এনে দেয়। তৃতীয় চলচ্চিত্র *বাইশে শ্রাবণ* তাঁকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পরিচিত করে তোলে। ১৯৬৯ সালে তাঁর পরিচালিত চলচ্চিত্র *ভুবন সোম* মুক্তি পায়। এ চলচ্চিত্রে বিখ্যাত অভিনেতা উৎপল দত্ত অভিনয় করেন। অনেকের মতে এটি মৃণাল সেনের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র। *ভুবন সোম*-এর মধ্য দিয়ে কলকাতায় 'নতুন সিনেমা' আন্দোলনের সূত্রপাত। তাঁর কলকাতা ট্রিলজি অর্থাৎ *ইন্টারভিউ* (১৯৭১), *ক্যালকাটা ৭১* (১৯৭২) এবং *পদাতিক* (১৯৭৩) চলচ্চিত্র তিনটির মাধ্যমে তিনি তৎকালীন কলকাতার অস্থির সময়কে সেলুলয়েডে ধারণ করেন। এর পরের দুটি চলচ্চিত্র– *একদিন প্রতিদিন* (১৯৭৯) এবং *খারিজ* (১৯৮২)-এর মাধ্যমে তিনি মধ্যবিত্ত সমাজের নীতিবোধকে তুলে ধরেন। চলচ্চিত্র দুটি খুবই প্রশংসিত হয়। ১৯৮৩ সালের কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে *খারিজ* বিশেষ জুরি পুরস্কার লাভ করে। ১৯৮০ সালে তিনি নির্মাণ করেন *আকালের সন্ধানে*। এই চলচ্চিত্রে দেখা যায় একটি চলচ্চিত্র কলাকুশলীদল একটি গ্রামে গিয়েছে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষের উপর একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য। কিভাবে ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের কাল্পনিক কাহিনি সেই গ্রামের সাধারণ মানুষদের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় সেটাই ছিল এই চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু। *আকালের সন্ধানে* ১৯৮১ সালে বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ জুরি পুরস্কার হিসেবে রুপোর ভালুক জয় করে। মৃণাল সেনের পরবর্তীকালের চলচ্চিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য *মহাপৃথিবী* (১৯৯২) এবং *অন্তরীণ* (১৯৯৪)। ২০০২ সালে এখন অবধি তাঁর শেষ চলচ্চিত্র *আমার ভুবন* মুক্তি পায়।

মৃণাল সেন বাংলা ছাড়াও হিন্দি, ওড়িয়া ও তেলেগু ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। ১৯৬৬ সালে তিনি কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীর গল্প অবলম্বনে ওড়িয়া ভাষায় নির্মাণ করেন *মাটির মনীষ*। ১৯৬৯ সালে বনফুলের কাহিনি অবলম্বনে হিন্দি ভাষায় নির্মাণ করেন *ভুবন সোম*। ১৯৭৭ সালে মুন্সি প্রেমচাঁদের গল্প অবলম্বনে তেলেগু ভাষায় নির্মাণ করেন *ওকা উরি কথা*। ১৯৮৫ সালে নির্মাণ করেন *জেনেসিস*, যা হিন্দি, ফরাসি ও ইংরেজি তিনটি ভাষায় তৈরি হয়।

মৃণাল সেন পরিচালিত চলচ্চিত্রগুলি প্রায় সবকটি বড় চলচ্চিত্র উৎসব থেকে পুরস্কার লাভ করে। ভারত এবং ভারতের বাইরের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে। তিনি ইন্টারন্যাশন্যাল ফেডারেশন অফ দি ফিল্ম সোসাইটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

১৯৮১ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ পুরস্কারে ভূষিত করে; ২০০৫ সালে লাভ করেন দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার। তিনি ১৯৯৮ থেকে ২০০৩ অবধি ভারতীয় সংসদের উচ্চ কক্ষ রাজ্যসভার সাম্মানিক সদস্যপদ অলংকৃত করেন। ফরাসি সরকার তাঁকে কম্যান্ডার অফ দি অর্ডার অফ আর্টস অ্যান্ড লেটারস (Ordre des Arts et des Lettres) সম্মানে সম্মানিত করেছে। এটি ফ্রান্সের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান। ২০০০ সালে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তাঁকে অর্ডার অফ ফ্রেন্ডশিপ সম্মানে ভূষিত করেন।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

উপরে ॥ ১. ০২ এপ্রিল ২০১৬ গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে ষড়জ-পঞ্চম স্কুলের শিক্ষার্থীদের হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন ২. ০৯ এপ্রিল ২০১৬ সন্ধ্যায় আইজিসিসি গুলশান মিলনায়তনে শ্রীমতী অনামিকা ত্রিপুরার কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত ও আদিবাসী চাকমা গান পরিবেশন ৩. ০৮ এপ্রিল ২০১৬ সন্ধ্যায় একই মিলনায়তনে অনিমা মুক্তি গোমেজের কণ্ঠে লোকসংগীত পরিবেশন ৪. ২৩ এপ্রিল ২০১৬ সন্ধ্যায় একই মিলনায়তনে শফিউল আলম রাজার কণ্ঠে ভাওয়াইয়া গান পরিবেশন ৫. ৩০ এপ্রিল ২০১৬ সন্ধ্যায় একই মিলনায়তনে সাবেক সিনিয়র সচিব রণজিৎ বিশ্বাসের আবৃত্তি ও আলোচনা অনুষ্ঠান

নিচে ॥ ২৯ এপ্রিল ২০১৬ সন্ধ্যায় গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে মুস্তফা জামান আব্বাসী ও তাঁর কন্যা সামিরার কণ্ঠে গজল পরিবেশন

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra May 2016

সত্যমেব জয়তে

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা

জ্ঞাতব্য তথ্য

নতুন আইভিএসি কেন্দ্র

ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপলিকেশন সেন্টার (আইভিএসি)-এর মাধ্যমে ভারতীয় ভিসা আবেদন গ্রহণের জন্য ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার স্বীকৃত এজেন্ট এস্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা দিচ্ছে যে, এখন থেকে ভিসার আবেদনপত্র গ্রহণ ও বিতরণের জন্য ঢাকার উত্তরাসহ বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুরে নতুন আইভিএসি খোলা হয়েছে।

কার্যক্রমকাল

রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র গ্রহণ সকাল ৮.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা।
রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র বিতরণ বিকাল ৩.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০টা।

ঠিকানা

আইভিএসি-র সব কেন্দ্রে সব ধরনের ভিসা আবেদন গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে এখন নিম্নোক্ত আইভিএসি কেন্দ্রে বিদ্যমান। এগুলো হচ্ছে: আইভিএসি, গুলশান, ঢাকা ॥ আইভিএসি, মতিঝিল, ঢাকা ॥ আইভিএসি, ধানমন্ডি, ঢাকা ॥ আইভিএসি, উত্তরা, ঢাকা ॥ আইভিএসি, চট্টগ্রাম ॥ আইভিএসি, সিলেট ॥ আইভিএসি, খুলনা ॥ আইভিএসি, রাজশাহী ॥ আইভিএসি, বরিশাল নর্থ সিটি সুপার মার্কেট দ্বিতীয় তলা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, অমৃতলাল দে রোড, বরিশাল (এলাকা: বরিশাল, বরগুনা, ভোলা, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী ও পিরোজপুর) ॥ আইভিএসি, ময়মনসিংহ, ২৯৭/১ মাসকান্দা দ্বিতীয় তলা, মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ড, ময়মনসিংহ (এলাকা: জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর, টাঙ্গাইল ও ভালুকা) ॥ আইভিএসি, রংপুর, জে বি সেন রোড, রামকৃষ্ণ মিশনের বিপরীতে, মহিগঞ্জ, রংপুর (এলাকা: রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও এবং লালমনিরহাট)। উল্লেখ্য, ঢাকার বাইরের এলাকার ভিসা আবেদন ঢাকার কোন কেন্দ্রে গ্রহণ করা হবে না।

ভিসা আবেদন করার সময় আবেদনকারীদের সঠিক বিভাগ নির্ধারণ করে আবেদন করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সব দলিল সঠিক, সম্পূর্ণ ও অবিকল হওয়া চাই। আবেদনকারীদের এজেন্ট ও মধ্যবর্তী মানুষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার এবং এসব ক্ষেত্রে নিকটতম থানা/আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আইভিএসি বাংলাদেশে তার পক্ষে কাজ করার জন্য কোন ব্যক্তি/সংস্থাকে অনুমোদন দেয়নি।

পুনর্নির্ধারিত প্রক্রিয়া ফি

১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে পুনর্নির্ধারিত ভিসা প্রক্রিয়া ফি নিম্নোক্ত হারে কার্যকর হবে: ১. ঢাকার সব আইভিএসি কেন্দ্র– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০। ২. আইভিএসি, চট্টগ্রাম– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৩. আইভিএসি, রাজশাহী– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৪. আইভিএসি, সিলেট– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৫. আইভিএসি, খুলনা– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৬. আইভিএসি, বরিশাল– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ৭. আইভিএসি, ময়মনসিংহ– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৩. আইভিএসি, রংপুর– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০।

আলোকচিত্র আপলোডের নতুন পদ্ধতি:

আবেদনকারীদের অনলাইন আবেদনপত্রে দেওয়া নির্ধারিত জায়গায় তাদের আলোকচিত্র স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। স্ক্যানকৃত আলোকচিত্র ছাড়া আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

হেল্পলাইনসমূহ

হেল্পলাইন টেলিফোন/ফ্যাক্স/ ই-মেইলসমূহ: ০০-৮৮-০২ ৮৮৩৩৬৩২২ ॥ ০০-৮৮-০২ ৯৮৯৩০০৬ ॥ ০০-৮৮-০১৭১৩ ৩৮৯৪৯৯ ০০-৮৮-০২ ৯৮৬৩২২৯ (ফ্যাক্স) ॥ visahelp@ivacbd.com. আরো সাহায্যের জন্য ই-মেইল: visahelp@hcidhaka.gov.in
ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যে-কোন ধরনের প্রশ্নের জবাব পেতে ভিজিট করুন: http://www.ivacbd.com/faq.php

জনস্বার্থে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক প্রচারিত